আওয়ামী লীগ

# যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১

মহিউদ্দিন আহমদ

আওয়ামী লীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ ● মহিউদ্দিন আহমদ

পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে তখন তিনটি প্রধান পক্ষ—আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি এবং সেনাবাহিনী। আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা প্রবেশ করেছিলাম একটা রক্তাক্ত অধ্যায়ে। এই বইয়ে আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ-পর্বের একটা ছবি এঁকেছেন গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম স্বাভাবিকভাবে হয়নি। একটি রাষ্ট্র ভেঙে আরেকটি রাষ্ট্র, তা-ও আবার আপসে নয়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন উদাহরণ বিরল। বাংলাদেশের ঠিকুজি খুঁজতে গেলে আওয়ামী লীগের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এই বইয়ে আছে দলটির ওই সময়ের পথচলার বিবরণ, যখন দেশ একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ ছিল বাঙালির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অনিবার্য গন্তব্য। আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা একটা রক্তাক্ত অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিলাম। আওয়ামী লীগ হয়ে উঠেছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ওই পর্বের একটা ছবি আঁকা হয়েছে এই বইয়ে।

আলোকচিত্র : সাইফুল ইসলাম

মহিউদ্দিন আহমদ

জন্ম ১৯৫২, ঢাকায়। পড়াশোনা গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। ১৯৭০ সালের ডাকসু নির্বাচনে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিএলএফের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এ কাজ করেছেন প্রতিবেদক ও সহকারী সম্পাদক হিসেবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাস্টার্স ইন এনজিও স্টাডিজ' কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও অধ্যাপক। তাঁর লেখা ও সম্পাদনায় দেশ ও বিদেশ থেকে বেরিয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা অনেক বই। প্রথমা প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, *বিএনপি : সময়-অসময়* ও *আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*। *প্রথম আলোয়* কলাম লেখেন।

প্রচ্ছদ : **মাসুক হেলাল**

আওয়ামী লীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১
গ্রন্থস্বত্ব : ২০১৭ মহিউদ্দিন আহমদ
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪২৪, মে ২০১৭
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

**মূল্য : ৩৬০ টাকা**

Awami League: Juddhodiner Kotha 1971
by Mohiuddin Ahmad
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 360 only

ISBN 978 984 92742 4 7

উ ৎ স র্গ

ঈসা

# সূচিপত্র

# ভূমিকা

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরপরই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি একটি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়, যার অনিবার্য পরিণতি হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এর আছে এক বিস্তৃত পটভূমি। এ প্রসঙ্গে কবি-সাংবাদিক মাশুক চৌধুরীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ইতিহাসের বুকের ওপর
হাজার বছরের পুরোনো একটা পাথর ছিল
সেই পাথর ভেঙে ভেঙে
আমরা ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতা
এই ইতিহাসটুকু আজো লেখা হয়নি।

ইতিহাস হলো নির্দিষ্ট একটা সময়ের দলিল। সময় হলো কতগুলো ঘটনার পরম্পরা, যা এক দিনে নির্মিত হয় না। ইতিহাসও এক দিনে লেখা যায় না। ইতিহাস নিয়ে আমাদের আছে প্রবল আগ্রহ এবং জিজ্ঞাসা। এই তাড়না থেকেই লিখে যাচ্ছি। আমার লেখার বিষয় রাজনীতির সুলুকসন্ধান করা। এর আগে জাসদ এবং বিএনপি নিয়ে লিখেছি। তো একপর্যায়ে হাত দিলাম আওয়ামী লীগে। এটি একটি পুরোনো এবং বড় রাজনৈতিক দল। বিশাল এর ক্যানভাস। ইতিমধ্যে *আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব* নামে আমার একটি বই বেরিয়েছে প্রথমা প্রকাশন থেকে। ওই বইয়ে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এবার লিখছি আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধকালীন অধ্যায়টি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম স্বাভাবিকভাবে হয়নি। একটি রাষ্ট্র ভেঙে আরেকটি রাষ্ট্র, তা-ও আবার আপসে নয়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এমন একটা উদাহরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিরল। বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চা তাই সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। আর দেশটির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের ঠিকুজি খুঁজতে গেলে তাই আওয়ামী লীগের প্রসঙ্গ এসে পড়বেই।

মুক্তিযুদ্ধের ২৬৮ দিনের পর্বটির একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। যুদ্ধ তো হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়নি। যুদ্ধের সময়টায় ছিল নানান টানাপোড়েন। ছিল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানান দ্বন্দ্ব। এর সবটা এখনো অজানা। সবকিছু ছকে বাঁধা ছিল না, সরলরেখায় চলেনি। বহুমাত্রিক এই অধ্যায়ের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি দুই মলাটের মধ্যে বন্দী করা অসম্ভব।

বাহাত্তর সালের ৭ ফেব্রুয়ারি লেখক-সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করে একাত্তর সালের সরকার গঠন ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। ঘটনাটি তিনি *আত্মস্মৃতি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জবাবে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'আমি, আপনি এবং কমরুদ্দীন সাহেব একত্রে বসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে পারি।' পরে বললেন, 'এখন সত্য ইতিহাস লেখা যাবে না। লিখবেন না, লিখলে মেরে ফেলবে।' বোঝা যায়, একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে অনেক টানাপোড়েন ছিল। অনেক সত্যই চাপা পড়েছে বা চাপা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষী একেকজন ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও মৃত্যু হয়।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের মধ্যে আছে প্রচণ্ড আবেগ। এর একটা বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ বয়ান তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য এখনো আমাদের সংগ্রহে নেই। যখন যেটুকু জানতে পারি, তার ভিত্তিতেই আমরা লিখি। এখানেও সেই চেষ্টা হয়েছে। তা ছাড়া অনেক কিছু লেখার মতো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়নি। নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ গ্রহণ করার মতো পাঠকমন তৈরি হওয়ার জন্যও সময় দরকার। এ দেশে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

তবে এটি কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়। এ হলো আওয়ামী লীগের পথচলার একটি অংশের বিবরণ, যখন দেশ একটি যুদ্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিল। এই যুদ্ধ ছিল আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের অনিবার্য গন্তব্য।

পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে তখন তিনটি প্রধান পক্ষ—আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনী। একটা টেকসই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি করা নিয়ে এই তিন পক্ষ একমত হতে পারেনি। একমত হওয়ার সুযোগও ছিল না। কেননা একটি পক্ষ চেয়েছিল বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র কাঠামোটি টিকিয়ে রাখতে, যেখানে পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা আঁতাত তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে এটা ছিল পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াই। আওয়ামী লীগ বাঙালি জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা একটা রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। এই

বইয়ে আমি ওই পর্বের একটা ছবি আঁকতে চেয়েছি। তবে ছবিটা আংশিক। এ নিয়ে অনেকেই লিখেছেন, আরও অনেকে লিখবেন। তারপর আমরা মুক্তিযুদ্ধের একটা পরিপূর্ণ অবয়ব হয়তো দেখতে পাব।

বইটি লিখতে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া প্রাসঙ্গিক অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইয়ের শেষে দেওয়া আছে। এ বইয়ে যেসব ছবি ব্যবহার করেছি, তা বিভিন্ন পত্রিকা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।

কাজটি করতে গিয়ে অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি। আমার যেটুকু জানা, তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। একটা মাত্র বইয়ে একাত্তর সালের টালমাটাল দিনগুলোতে আওয়ামী লীগের সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে এ কাজে অংশ নিয়েছি মাত্র।

লেখায় কিছু ভুল থাকতে পারে। শুদ্ধতার কোনো সীমা নেই। শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠক ভুল ধরিয়ে দিয়ে লেখাটি যদ্দুর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখতে সাহায্য করবেন বলে আশা করছি।

**মহিউদ্দিন আহমদ**

mohi2005@gmail.com

# সংলাপ

১৯৭০ সাল, ৭ ডিসেম্বর সকাল আটটা। প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তাঁর এডিসি স্কোয়াড্রন লিডার আরশাদ সামি খানকে নিয়ে ভোট দিতে রাওয়ালপিন্ডির প্রেজেন্টেশন কনভেন্ট স্কুলে যাবেন। গাড়িচালক এজাজ কালো ক্যাডিলাক বের করল। যেতে যেতে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মনে আছে তো, সাইকেল মার্কায় ভোট দিতে হবে। সাইকেল মার্কাকে জিততেই হবে, জিততেই হবে।' সাইকেল হলো কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রতীক। আইয়ুব খান এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। সামি খান ভাবছেন, প্রেসিডেন্টের সামনে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে। প্রেসিডেন্ট ভবনের সুরক্ষিত চার দেয়ালের ভেতরে বসে এবং জাতীয় নিরাপত্তা সেলের পুরোনো একটি রিপোর্টের ওপর ভরসা করে আছেন তিনি। সামি খান অবাক হলেন এই ভেবে যে জাতীয় নিরাপত্তা সেলের প্রধান মেজর জেনারেল গোলাম উমর প্রেসিডেন্টকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচনের ফলাফল শোনার জন্য সামি খানকে নিয়ে টেলিভিশনের সামনে আয়েশ করে বসলেন। এক এক করে ফলাফল আসছে, আওয়ামী লীগ আর পিপলস পার্টির জয়রথ ছুটে চলেছে। রাত তিনটার দিকে যখন অধিকাংশ আসনের ফল ঘোষণা করা হয়ে গেছে, ইয়াহিয়া খুবই মনমরা হয়ে পড়লেন। এডিসিকে বললেন, 'উমরকে এখনই খবর দাও।' এডিসি ফোনে জেনারেল উমরকে পেলেন। উমর বললেন, 'প্রেসিডেন্ট কি বেশি রেগে আছেন?' এডিসি বললেন, 'আপনার কেমন মনে হয়?' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া উমরের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন।

ইয়াহিয়া : উমর, এসব হচ্ছেটা কী? তোমার সব হিসাব-নিকাশ কোথায় গেল? কাইয়ুম খান, সবুর খান আর ভাসানীকে যে এত টাকাপয়সা দিলাম, সেসব কোথায় গেল? তুমি কি লাইনে আছ, উমর? বোবা হয়ে গেছ নাকি? কথা বলো।

উমর : জি স্যার, জি স্যার, আমি শুনছি স্যার, আমি শুনছি।

ইয়াহিয়া : শোনা বন্ধ করো এবং জবাব দাও। আমি জবাব চাই। কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে ভাবো। শুনতে পাচ্ছ?

উমর : জি স্যার, জি স্যার। আমি আর কী বলব। একটা পথ নিশ্চয়ই বের হবে।

ইয়াহিয়া : কান খুলে আমার কথা শোনো। এক সপ্তাহ পর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে। আমি ফলাফল উল্টে দিতে চাই। এখানে যারা খারাপ করেছে, ওটায় ওরা ভালো করবে। আমরা বলতে পারব, বড় দুটি দল জাতীয় নির্বাচনে কারচুপি করেছে, কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপে প্রাদেশিক নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। বুঝতে পেরেছ?

উমর : জি স্যার, জি স্যার।

ইয়াহিয়া খুবই বিরক্ত হলেন। এত দিন তাঁকে বোঝানো হয়েছে ৩৩টি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অথচ ফলাফল একেবারে উল্টো![১]

পত্রপত্রিকায় প্রেসিডেন্টকে সাধুবাদ জানিয়ে খবর ছাপা হলো, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলে যে বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেখানে হয়তো প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি হতে পারেন একজন 'সৎ মধ্যস্থতাকারী'। দুদিন পর ইয়াহিয়া উমরকে ডেকে বললেন, কিছুই করতে হবে না। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার দরকার নেই।[২]

নির্বাচন নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার যে সূক্ষ্ম একটি পরিকল্পনা ছিল, উমরের সঙ্গে সংলাপে সেটি স্পষ্ট। প্রশ্ন হলো, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। এটি কি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাফিলতি, নাকি বাইরের কারও সঙ্গে তাঁদের আঁতাতের ফল। ইয়াহিয়া কখনো এটি খুঁজে দেখার চেষ্টা করেননি। করলে হয়তো থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ত।[৩]

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো দুজনকেই অভিনন্দন জানিয়ে ইয়াহিয়া বার্তা পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগের মাসগুলোতে সামরিক আদালতে যাঁরা বিভিন্ন অভিযোগে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই সাধারণ ক্ষমার আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য মাহমুদ হারুনকে ঢাকায় পাঠান। মাহমুদ হারুন হলেন ইউসুফ হারুনের ভাই এবং শেখ মুজিবের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি। শেখ মুজিবকে ইসলামাবাদে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ইসলামাবাদে যেতে অপারগতা জানান। বিষয়টিকে অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে চান যে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। অন্য

একটি ব্যাখ্যাও ছিল। মুজিব চেয়েছিলেন এর পর রাজনীতির কেন্দ্র হবে ঢাকা। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক আমানউল্লাহর সঙ্গে শেখ মুজিবের একটি অনানুষ্ঠানিক আলাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সত্তরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সিলেটে নির্বাচনী সফর শেষে শেখ মুজিব সড়কপথে ঢাকায় ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গে দলের অন্যরা ছাড়াও ছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক। এপিপির পক্ষ থেকে মুজিবের নির্বাচনী সফর কভার করছিলেন আমানউল্লাহ। তিনি পারিবারিকভাবে শেখ মুজিবের পরিচিত ছিলেন। আমানউল্লাহর বাবা বি ডি হাবীবউল্লাহ ছিলেন শেরেবাংলার অনুজপ্রতিম এবং শেখ মুজিব তাঁকে খুব সম্মান করতেন, যদিও দুজনের রাজনীতি ছিল দুই মেরুর। তখন রাত। মেঘনাঘাটে ফেরি পার হওয়ার সময় শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'আমানউল্লাহ, আমি নির্বাচনে জিতবই। এবং আমি হয়তো একবার ইসলামাবাদ যাব। তারপর আর না। ঢাকা হবে আমার হেডকোয়ার্টার। আমি সব সেক্রেটারিকে ঢাকায় তলব করব। ওরা সবাই এখানে আমার সঙ্গে কাজ করবে, যত দিন আমি চাইব তত দিন। সবকিছুই হবে ঢাকাকেন্দ্রিক।'[৪]

নির্বাচনের ফলাফলে ইয়াহিয়া যে একেবারে আকাশ থেকে পড়েছেন, তা কিন্তু নয়। নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর ইয়াহিয়া যখন নির্বাচন পেছাতে রাজি হননি, তখনই তাঁর সংবিধানবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী তাঁকে এর সম্ভাব্য ফল কী হতে পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়ার সাফ জবাব ছিল, 'অর্থাৎ মুজিবের জয় হবে? হ্যাঁ, আমি তা জানি এবং এ নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আহসান ও পীরজাদার সঙ্গে মুজিবের অনেক কথা হয়েছে এবং তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছে, সে ছয় দফা সংশোধন করবে। ইনশাআল্লাহ পাকিস্তান রক্ষা পাবে, কোনো চিন্তা করবেন না।'[৫]

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। এত দিন ছয় দফা ছিল স্বায়ত্তশাসনের জন্য দর-কষাকষির অস্ত্র। নির্বাচনে একচেটিয়া জয় তাঁর মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ। ইয়াহিয়ার প্রশাসন বা সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর যে কোনো পরোয়া ছিল না, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় পররাষ্ট্রসচিব সুলতান মোহাম্মদ খানের বিবরণে।

সুলতান খান সিঙ্গাপুরে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন শেষে ফেরার পথে ঢাকায় আরসিডির (রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট) সদস্য পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি বৈঠকে অংশ নেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশির জাহেদি ও তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যালিয়াংগিল তাঁর কাছে জানতে চান, নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে পারবেন কি না। সুলতান খান বলেন, এতে কোনো সমস্যা নেই।

শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা সুলতান খানকে বলেন, মুজিবকে মনে হলো আপসহীন; তিনি বলেছেন, জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে নতুন এক জাতির পিতা হতেই পছন্দ করবেন। তাঁরা দুজনই বেশ বিচলিত হয়েছেন। জাহেদি ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁরা ইসলামাবাদ পৌঁছালে ইয়াহিয়া তাঁদের মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানান। জাহেদির কথা শুনে ইয়াহিয়া বলেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলে মুজিব আসলে বিদেশি অতিথিদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। জাহেদিকে আশ্বস্ত করে ইয়াহিয়া বলেন, মুজিবের সঙ্গে কাজ করতে তাঁর অসুবিধা হবে না।[৬]

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো মনে করতেন, তাঁর সঙ্গে সমঝোতা না করে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারবে না। ২০ ডিসেম্বর লাহোরে পাঞ্জাব অ্যাসেম্বলি চেম্বারসের সামনে পিপিপির এক সমাবেশে তিনি বলেন, তাঁর দলের সহযোগিতা ছাড়া সংবিধান ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসার জন্য পিপিপি প্রস্তুত নয়। তিনি আরও বলেন, 'পিপিপির পক্ষে আরও পাঁচ বছর (পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত) অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।' তিনি বলেন, 'জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো দাম নেই। কেন্দ্রের আসল শক্তি হলো সিন্ধু ও পাঞ্জাব। প্রদেশ দুটিতে পিপিপি জিতেছে। সুতরাং পিপিপির সমর্থন ছাড়া কেন্দ্রে কোনো সরকার থাকতে পারে না। তিনি যদি বিরোধী দলে থাকেন, তাহলে কীভাবে তিনি জনগণের সমস্যার সমাধান করবেন?'[৭]

পরদিন ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের রায় পেয়েছে এবং সে একাই সংবিধান তৈরি ও কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখে। আওয়ামী লীগ তার দলের নীতি ও কর্মসূচির আলোকে প্রয়োজনবোধে অন্যদের সমর্থন চাইতে পারে।[৮]

আওয়ামী লীগের বিজয়ে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১২ জন জেনারেল শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী ছিলেন বলে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তথ্য দিয়েছেন। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর খান বলেছিলেন, 'আমরা ওই হারামজাদাকে দেশ শাসন করতে দেব না।' তাঁদের আশঙ্কা ছিল, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তারা ভারতের প্রতি নমনীয় হবে, কাশ্মীর সমস্যার দিকে নজর দেবে না, প্রতিরক্ষা

খাতের বরাদ্দ কেটে উন্নয়ন খাতে নিয়ে যাবে এবং জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা বিচার না করে বাঙালিদের অধিক হারে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে বসাবে। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতির ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তা কমে যাবে।'[৯]

৩ জানুয়ারি (১৯৭১) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বয়ং শেখ মুজিব। নৌকা আকৃতির একটি বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সবাই মঞ্চে ছিলেন। শপথনামায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনসংবলিত সংবিধান তৈরি করতে অঙ্গীকার করেন। শপথ নেওয়া শেষ হলে শেখ মুজিব উপস্থিত জনতাকে আহ্বান করে বলেন, 'কেউ যদি বাংলার মানুষের সঙ্গে বেইমানি করে তবে তোমরা তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।' শেখ মুজিব 'জয় বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান' বলে ভাষণ শেষ করেছিলেন।[১০]

শপথ অনুষ্ঠানে বিদেশি কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মঞ্চের সামনে সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত স্থানের পাশে তাঁদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ভারত ও ইরান দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। চীন ও রাশিয়ার দূতাবাস প্রতিনিধির অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।[১১]

৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রমনার বটমূলে ছাত্রলীগের বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের একটি সম্মিলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও ড. কামাল হোসেন। অনুষ্ঠানে সদ্যনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর বদলে ছাত্রলীগের সহসম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হক সভা পরিচালনা করেন।

সভা শুরু হওয়ার আগে ২০-২৫ জনের একটি দল স্লোগান দিতে দিতে সভা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। তাদের স্লোগানগুলো ছিল: বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো, মুক্তিফৌজ গঠন করো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো, লাল সূর্য উঠেছে—বীর জনতা জেগেছে, মুক্তির একই পথ—সশস্ত্র বিপ্লব, স্বাধীন করো স্বাধীন করো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো, শেখ মুজিবের মন্ত্র—সমাজতন্ত্র। এ সময় আরেকটি গ্রুপ অন্য রকম স্লোগান দেয়। তাদের

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ছাত্রলীগের স্লোগান

স্লোগান ছিল : শেখ মুজিবের মতবাদ—গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, ছয় দফা মানতে হবে—নইলে গদি ছাড়তে হবে ইত্যাদি। স্লোগানগুলোর মধ্যে ছাত্রলীগের মধ্যকার বিপরীতধর্মী দুটি প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতার একপর্যায়ে বললেন, কিছু কিছু ছেলে সংগঠনবিরোধী স্লোগান দিয়েছে। দলে এসব বরদাশত করা হবে না। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে স্লোগান প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে উদ্দেশ করে একটু কৌতুকও করেন, 'আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট, আমি মাঠের ডক্টরেট।' তবে স্লোগান-পাল্টা স্লোগানের মধ্য থেকে উঠে আসা বার্তাটি শেখ মুজিব ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন 'জয় বাংলা' বলে। অন্যান্য দিনের মতো 'জয় পাকিস্তান' আর বলেননি।[১২]

৯ জানুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটি জাতীয় সম্মেলন ডাকেন। সম্মেলনে তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি করেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে নভেম্বরে পল্টনের এক জনসভায় তিনি এ দাবি উচ্চারণ করেছিলেন। ওই সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ সোলায়মান ও পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া।

নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে যখন বিভিন্ন দলের মধ্যে সংবিধান তৈরির প্রশ্নে সংলাপ ও সমঝোতার বিষয়টি নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন, ঠিক সে সময় এ ধরনের দাবি উত্থাপন করার কী যুক্তি থাকতে পারে, তা বোঝা কষ্টকর। মওলানা ভাসানীকে ১৯৬৩ সালের পর থেকেই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা নানাভাবে ব্যবহার করেছে। তাঁর এ দাবির আড়ালে অন্য কিছু আছে কি না, তা নিয়ে বেশ গুঞ্জন ছিল। যা হোক, সন্তোষে আয়োজিত সম্মেলনে দাবি আদায়ের জন্য মওলানা ভাসানীকে আহ্বায়ক করে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ ও ন্যাপ (ভাসানী) থেকে পাঁচজন করে প্রতিনিধি নিয়ে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ন্যাশনাল লীগের আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান ও আমেনা বেগম এবং ন্যাপের মশিউর রহমান, আবদুল জলিল ও আবদুল জব্বার।[১৩]

নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে একটি কার্যকর সংবিধান তৈরি করা। এত দিন যা ছিল দাবি, এখন তা হয়ে দাঁড়াল দায়িত্ব। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমদকে নিয়ে শেখ মুজিবের একটি অনানুষ্ঠানিক 'হাইকমান্ড' ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁদের সঙ্গে বারবার বৈঠক করেন। সংবিধান তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞের দরকার ছিল। শেখ মুজিব এ কাজে তাঁর পরীক্ষিত সহযোগীদের জড়ালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ড. কামাল হোসেন ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার মাঝামাঝি পথে বুড়িগঙ্গার পারে পাট ব্যবসায়ী হামিদের বাড়িতে লোকচক্ষুর আড়ালে চলত তাঁদের আলোচনা। ঢাকা থেকে তাঁরা ভোরবেলায় যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যার পর। তাঁরা যেসব নোট তৈরি করতেন, সেগুলো শেখ মুজিবের হাতে দেওয়া হতো এবং মুজিব তা নিজের কাছেই রাখতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সংলাপ ও দর-কষাকষির জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির কাজ শেখ মুজিব আগেভাগেই করে রাখলেন। অতি গোপনে কাজটি করা হলেও

গণমাধ্যম ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে তার কিছু অংশ ফাঁস হয়ে যায়। শেখ মুজিব এ জন্য খন্দকার মোশতাককে সন্দেহ করতেন। মোশতাক ছয় দফার ব্যাপারে আপস করতে আগ্রহী ছিলেন।[১৪]

নির্বাচনের পরপরই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিজয়ী প্রধান দুটি দলের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সিদ্ধান্ত নেন। ১১ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় আসেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সেনাসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ মহিউদ্দিন পীরজাদা, ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার উল করিম (পরে মেজর জেনারেল) ও লে. কর্নেল মাহমুদ। করিম ও মাহমুদ দুজনই ছিলেন বাঙালি। করিম প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে বসতেন এবং মাহমুদ ছিলেন পীরজাদার স্টাফ অফিসার। করিমকে পীরজাদার ডান হাত মনে করা হতো।[১৫]

ইয়াহিয়া রওনা হওয়ার আগে করাচি বিমানবন্দরে এবং ঢাকায় পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ খোলামেলাভাবেই বলেন, তিনি ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। ঢাকায় পৌঁছে ইয়াহিয়া তাঁর সাহায্যকারী দলের সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক সভা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন লে. জেনারেল পীরজাদা, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার করিম। সভায় শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী এবং ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট রেখে কীভাবে ক্ষমতার একটি কার্যকর বিন্যাস করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, প্রেসিডেন্টের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ছাড়াও সংস্থাপন বিভাগ এবং বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ তিন বাহিনীর প্রধান নিয়োগের ক্ষমতা থাকতে হবে। পরবর্তী সময়ে গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায় যে এসব কথাবার্তা শেখ মুজিবের কাছে দ্রুতই পৌঁছে গিয়েছিল। পরদিন সকালে শেখ মুজিব যখন তাঁর সহযোগীদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন, তিনি তখন মোটামুটি ওয়াকিবহাল, কী নিয়ে আলোচনা হতে যাচ্ছে এবং এর মোকাবিলা হবে কেমন করে, তার প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে রেখেছেন।[১৬]
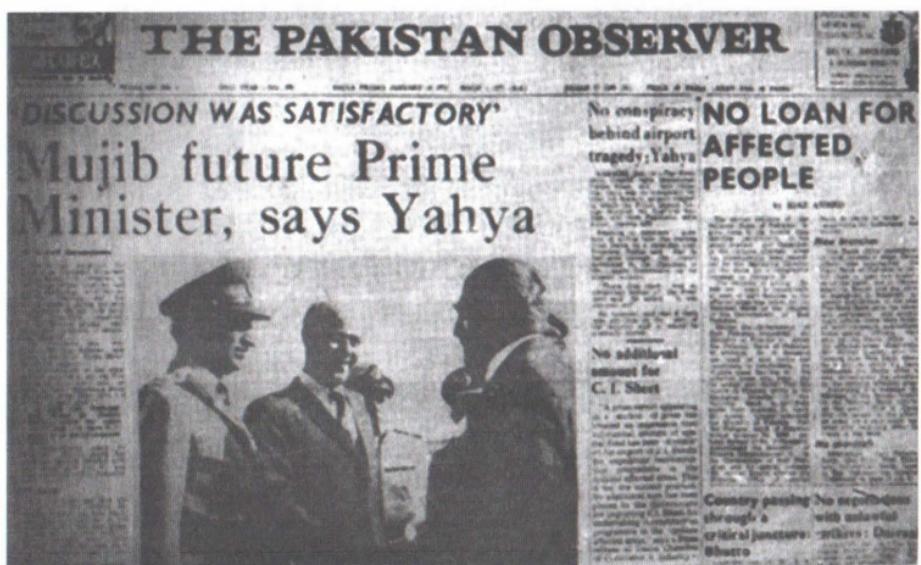
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। প্রেস ফটোগ্রাফারদের ফটোসেশন চলল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হলো সভা। প্রেসিডেন্টের এডিসি আরশাদ সামি খান সভাকক্ষের সঙ্গে লাগোয়া খাবার ঘরের একটি সুবিধাজনক জায়গায় বসলেন, যেখান থেকে সব কথাবার্তা শোনা যায়।[১৭]

ইয়াহিয়া তাঁর কথা শুরু করলেন। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিশাল জয় পেয়েছে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তার কোনো সমর্থন নেই। পিপলস পার্টি পশ্চিম

পাকিস্তানে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তার কোনো আসন নেই। দেশের দুই অংশ যদি একটি ভূখণ্ড হতো, তাহলে হয়তো বিষয়টি অন্য রকম হতো। কিন্তু এখানে বাস্তবতা ভিন্ন। দুই প্রদেশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান, মাঝখানে বৈরী ভারত। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ যদি সরকার গঠন করে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো রকম সহযোগিতা না পায়, তাহলে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে। আওয়ামী লীগ হয়তো-বা একটি সংবিধান তৈরি করে দিতে পারে। কিন্তু সংবিধান তো কেবল একটি আইনমাত্র নয়। এটি একটি পবিত্র দলিল এবং এর ওপর সব প্রদেশের আস্থা থাকতে হবে। তা না হলে এটি কত দিন টিকবে?

ইয়াহিয়া ধীরে ধীরে যুক্তির জাল বিস্তার করছিলেন। এবার তিনি বললেন, একটি বিকল্প হলো আওয়ামী লীগ ভুট্টোর সঙ্গে কোয়ালিশন করতে পারে। যত দূর জানা গেছে, ভুট্টো তাঁর দলের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ঢাকায় পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যোগ দিতে নিষেধ করেছেন। বিষয়টি জেনে তিনি (ইয়াহিয়া) ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং এ কাজ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। ভুট্টো জবাব দিয়েছেন, 'জেনারেল সাহেব, আমরা রাজনীতিবিদেরা বলি এক রকম, কিন্তু ভাবি অন্য রকম।'

ইয়াহিয়া এরপর তৃতীয় একটি বিকল্পের কথা বললেন। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট দলগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে। কিন্তু এর ফল শুভ হবে না। ভুট্টো আমলাদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেন, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত দলগুলো ভুট্টোর

THE PAKISTAN OBSERVER

'DISCUSSION WAS SATISFACTORY'

Mujib future Prime Minister, says Yahya

No conspiracy behind airport tragedy: Yahya

NO LOAN FOR AFFECTED PEOPLE

Country passing through a critical juncture: Bhutto

শেখ মুজিবকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

দলের শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। সামরিক আইন উঠে গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

ইয়াহিয়া এবার তাঁর তুরুপের শেষ তাসটা বের করলেন। বললেন, তুর্কিপদ্ধতি একটি বিকল্প হতে পারে। ক্ষমতার সব কেন্দ্রকে একসঙ্গে না রাখলে কোনো দলের পক্ষেই সরকার চালানো সম্ভব নয়। অবশ্যই সেনাবাহিনীর সহযোগিতা দরকার। 'যদিও আমি ব্যারাকে ফিরে যেতে চাই, পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজনে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। সেনাবাহিনীর কাজ তো এটাই।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর দলের সদস্যরা চুপচাপ প্রেসিডেন্টের কথা শুনছিলেন। করিম ও মাহমুদের কল্যাণে তাঁরা আগেই জেনে গিয়েছিলেন, কী প্রস্তাব আসতে পারে। তাঁদের সংলাপ চলল কিছুক্ষণ।

মুজিব : আমি কি কিছু বলতে পারি?

ইয়াহিয়া : নিশ্চয়ই।

মুজিব : আমাকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা এবং প্রথমেই আমার দলের সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি বুঝতে পারছি, পরিস্থিতি কেন জটিল। খুবই সাবধানে বিষয়টি সামলাতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেনাবাহিনীর সমর্থন দরকার হবে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে আমার কিংবা আমার দলের কাছে এই প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি মেনে নেওয়া কষ্টকর হবে। বিশেষ করে তুর্কি স্টাইলের একটি ব্যবস্থা নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্যকেই মাটি করে দেবে। যেটুকু সম্ভব তা হলো, আপনি নামমাত্র (টিটুলার) প্রেসিডেন্ট হিসেবে থেকে যেতে পারেন, যেমনটি ভারতে আছে।

ইয়াহিয়া : শেখ সাহেব, নির্বাচনে বিশাল জয় পেয়ে নিশ্চয়ই আপনার মতিভ্রম হয়নি। আপনার প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন শক্তিশালী সেনাপতির, যাঁকে সবাই মান্য করবে। অথচ আপনি চাচ্ছেন একটি দন্তহীন সিংহ। একজন নামমাত্র প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের কোনো উপকারে আসবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের ধূর্ত রাজনীতিবিদ ও আমলাদের কথা না হয় বাদ দিলাম, অন্য কেউই তাঁর কথা শুনবে না। ভারতে স্বাধীনতার পর থেকেই একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং এটি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। পাকিস্তানে আমাদের নতুন করে শুরু করতে হচ্ছে।

মুজিব : স্যার, আপনি কি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির বদলে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রস্তাব করছেন?

ইয়াহিয়া : একটি মিশ্র ব্যবস্থা চাচ্ছি। এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকবে, প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থাকবে কয়েকটি।

মুজিব : অনুগ্রহ করে বলবেন কি, প্রেসিডেন্টের হাতে কোন মন্ত্রণালয়গুলো থাকবে?

ইয়াহিয়া : ধরুন দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য ও যোগাযোগ। এ ছাড়া সংস্থাপন বিভাগ এবং বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বাহিনীপ্রধান ইত্যাদি নিয়োগের ক্ষমতা।

মুজিব : অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে আমরা নামমাত্র প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন নেতাকে আপনি নামমাত্র প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব করছেন।

ইয়াহিয়া : সবকিছুই আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করা হবে। আমার টিম আপনার টিমের সঙ্গে বসে উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি আপস-ফর্মুলা বের করার উদ্যোগ নিক।

মুজিব : কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাকে আমার দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং এ জন্য আরও সময় দরকার। তবে আমি জানতে চাই, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হচ্ছে কবে? আমি চাই যতশীঘ্র সম্ভব এটি ডাকা হোক, অবশ্যই ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে।

ইয়াহিয়া : ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অধিবেশন ডাকা বাস্তবসম্মত নয়। আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, অধিবেশন বসবে ঢাকায়। কিন্তু সেখানে বসার আসন মাত্র ১৫০টি। অথচ প্রয়োজন ৩১৩টি আসনের। এটি প্রস্তুত করতে সময় লাগবে। এ ছাড়া আপনার উচিত হবে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সংবিধানের মূল বিষয়গুলো নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো। যত দূর মনে হয়, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে হয়তো অধিবেশন ডাকা যায়, তার আগে নয়।

মুজিব : এ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কারও সঙ্গে আলাপ করার প্রয়োজন দেখি না।[১৮]

এর কিছুক্ষণ পরই সভা শেষ হয়। শেখ মুজিব তাঁর দল নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবন ছেড়ে যান। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের সংলাপের বিষয় নিয়ে তাঁদের কাটাছেঁড়া চলে কিছুক্ষণ। মনে হলো, প্রেসিডেন্ট বেশ খোশমেজাজে আছেন। তিনি বললেন, মুজিবের কাছ থেকে জবাব পেলেই পরবর্তী আলোচনার তারিখ ঠিক করা হবে।

বিকেল পাঁচটায় কর্নেল মাহমুদ জানালেন, শেখ মুজিব তাঁর সহযোগীদের নিয়ে পরদিন প্রেসিডেন্টের সুবিধাজনক সময়ে আসতে চান। প্রেসিডেন্ট তাঁর রুটিন দেখলেন। দু-একটি কর্মসূচি কাটছাঁট করে বললেন, সকাল ১০টায় সভা হবে।

১৪ জানুয়ারি ১০টায় সভা শুরু হলো। মুজিব ইয়াহিয়াকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, একজন টিটুলার প্রেসিডেন্ট ছাড়া ইয়াহিয়াকে অন্য কিছু ভাবা তাঁর দলের পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর ইয়াহিয়া ও মুজিব দলের অন্যদের ছাড়া একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলেন। ইয়াহিয়া মুজিবকে বলেন, 'আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, দলের চরমপন্থীদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেবেন না। কেননা, আপনাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে হবে। আপনার উচিত পশ্চিম পাকিস্তান সফর করা এবং আপনার সরকার ও ভবিষ্যৎ সংবিধানের পক্ষে সমর্থন আদায় করা।'[১৯]

১৫ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে করাচি ফিরে যান। ঢাকা বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবকে আবারও ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেন। করাচির প্রেসিডেন্ট ভবনে দুদিন পর এক নৈশভোজে ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভুট্টো নৈশভোজে যোগ দেন। ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার এই যোগাযোগ পরবর্তী সময়ে দুজনের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে অনুমান করা হয়। এই যোগাযোগের উদ্যোক্তা ছিলেন জেনারেল পীরজাদা। যদিও নৈশভোজে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের তালিকায় তিনি ছিলেন না।[২০]

এক সপ্তাহ পর ইয়াহিয়া তাঁর কয়েকজন ব্যক্তিগত স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে লারকানায় ভুট্টোর পৈতৃক বাড়িতে বেড়াতে যান। উদ্দেশ্য, পাখি শিকার করা। কিন্তু নেপথ্যে অন্য কারণও ছিল। ইয়াহিয়ার এডিসি আরশাদ সামি খানের ভাষ্য অনুযায়ী, রাতের খাবার খেতে খেতে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে সোজাসাপটা প্রশ্ন করেন। তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

ভুট্টো : মুজিব ও আওয়ামী লীগের একগুঁয়েমির পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কী ভাবছেন?

ইয়াহিয়া : দুটো পথ আছে। একটি হলো পরিষদ ডেকে দেখা, রাজনীতিবিদেরা তাঁদের তৈরি জঞ্জাল কীভাবে সাফ করেন। দ্বিতীয় পথ হলো পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের জন্য মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়টি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু প্রথম পথটিই মনে হয় সুবিধাজনক। পার্লামেন্ট ব্যর্থ হতে বাধ্য, যদি না আওয়ামী লীগ আর পিপলস পার্টি একটি কার্যকর

কোয়ালিশন গঠন করতে পারে। আপনি কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এ রকম একটি জোট বাঁধতে ইচ্ছুক?

ভুট্টো: আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বেঁধে পাকিস্তান ভাঙার দায় কাঁধে নেওয়া? কখনো না, কখনো না।

ইয়াহিয়া: আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় আপনি মুজিবের পক্ষ নিয়েছিলেন। আইয়ুবকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল। অথচ আইয়ুব বারবার বলেছিলেন, মুজিব পাকিস্তানবিরোধী ও ষড়যন্ত্রকারী। এখন কী করে আপনি মুজিবের বিরুদ্ধে কথা বলেন?

ভুট্টো: জেনারেল সাহেব, এটি হচ্ছে রাজনীতি। রাজনীতি এমন একটি ধারণা, যেখানে চিরস্থায়ী কোনো বন্ধু বা শত্রু নেই। রাজনৈতিক সুবিধা হচ্ছে মূল বিষয়। আপনি কী করে প্রথম পথটির কথা ভাবলেন? সে তো প্রথমেই আপনাকে পদচ্যুত করবে এবং তার আস্থাভাজন এমন একজনকে আপনার জায়গায় বসাবে, ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সে হয়তো আপনি ও আইয়ুব খান দুজনকেই ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বিচার করবে, কেননা আপনারা দুজনই সংবিধান বাতিল করেছেন। জেনারেল সাহেব, আপনার জায়গায় আমি থাকলে দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিতাম।

ইয়াহিয়া: শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ দেশের একটি বড় রাজনৈতিক শক্তি। রাজনীতি থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ এবং এ জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন দরকার, পূর্ব পাকিস্তান থেকে তো বটেই, পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও এটি দরকার।

ভুট্টো: (সবুর খান ও মওলানা ভাসানীর প্রতি ইঙ্গিত করে) আপনি তো তাঁদের টাকাপয়সা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন নির্বাচনে হারার জন্য নয়। এখনই সময় তাঁদের কাছ থেকে প্রতিদান নেওয়ার।[২১]

লারকানা বৈঠক নিয়ে জেনারেল পীরজাদার বয়ানটি একটু অন্য ধরনের। একপর্যায়ে তিনিও আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। লারকানায় ভুট্টোর পৈতৃক বাড়ি শাহনেওয়াজ হাউসের বাগানে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন পিপলস পার্টির নেতা গোলাম মোস্তফা খার এবং চাচাতো ভাই মমতাজ আলী ভুট্টো। ইয়াহিয়ার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং সেনাসদরের পিএসও লে. জেনারেল পীরজাদা। এই বৈঠকে নানা রকম ষড়যন্ত্র হয় বলে গুঞ্জন ওঠে। পীরজাদার মতে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের মতো লারকানার বৈঠক 'ততটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না'। পীরজাদার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা পাকিস্তানি

গবেষক লে. জেনারেল কামাল মতিনউদ্দিনের বিবরণে ইয়াহিয়া-ভুট্টো সংলাপের একটি ছবি পাওয়া যায়।

ভুট্টো : (তিনটি সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে) মুজিব এককভাবে, পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট কয়েকটি দলকে সঙ্গে নিয়ে শাসন চালাবেন; তাঁর (ভুট্টোর) সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথভাবে সরকার গঠন করবেন; মুজিব ও ভুট্টো সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে দেশ শাসন করবেন।

ইয়াহিয়া : আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি আশা করব, এখন থেকে আপনারাই দায়িত্ব নেবেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়া সেনাবাহিনীর আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। আমি তো এখনো প্রেসিডেন্ট। কোনো সাহায্যের দরকার হলে আমি তো আছিই।

ভুট্টো : অনুগ্রহ করে মুজিবকে বলুন, ভুট্টোর হাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব। তাই দেশের স্বার্থে ভুট্টোকে সরকারে নেওয়া হলে তা সবার জন্যই ভালো হবে।

ইয়াহিয়া : (অবাক হয়ে) জুলফি, জুলফি, ভেবেচিন্তে কথা বলুন। সেনাবাহিনী কোনো হুকুম দেবে না বা তদবির করবে না। মুজিবের সঙ্গে কথা বলা আপনার দায়িত্ব এবং কাকে নেবেন বা নেবেন না এটি তাঁর বিষয়।

ভুট্টো : না, না, আমি কথাটা সে অর্থে বলিনি। পাকিস্তানে একটি কোয়ালিশন সরকার হলে ভালো হতো না?

পীরজাদা : আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে একচেটিয়া জয় পেয়েছে। কিন্তু আপনি পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাভাবিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন মাত্র। দুজনের অবস্থান এক নয়।

ভুট্টো : তা হতে পারে। কিন্তু জেনারেল, আমি আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলছি।

ইয়াহিয়া : আমি আপনাকে মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে বলব। আমি মুজিবকেও বলব, ছয় দফার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি যেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, যাঁদের অন্যতম আপনি। তিনি আপনাকে বাদ দিতে পারবেন না। আপনাকে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে হবে, নতুবা আপনাকে বিরোধী দলের আসনে বসতে হবে। তাতে বিরোধী দল বেশ শক্তিশালী হবে বৈকি।

ভুট্টো : (পীরজাদার কানে কানে) আপনারা কি আমাকে বন্দরনায়েক ভাবছেন (অর্থাৎ তিনি বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে চান না)?[২২]

হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে আলাপ শেষ হলো। লারকানা ছেড়ে যাওয়ার আগে ইয়াহিয়া ভুট্টোকে ঢাকায় গিয়ে মুজিবের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। ভুট্টো ঢাকায় এলেন ২৭ জানুয়ারি। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী ছিল। কয়েক

দফা বৈঠকের পর ভুট্টো করাচি ফিরে যান। তিনি বলেন, দুই বড় দলের মধ্যে আরও আলাপ-আলোচনার দরকার আছে। ঢাকায় মুজিব-ভুট্টো সংলাপ নিয়ে একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়।

মুজিব-ভুট্টো সংলাপ ঢাকায় শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৭ জানুয়ারি ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাসায়। পরদিন সকালে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টির বিশেষজ্ঞ আলোচক দল তাদের মধ্যে মতবিনিময় করে। সন্ধ্যায় শেখ মুজিব হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠকে বসেন। ৭০ মিনিটের এই সভা আন্তরিক পরিবেশে হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছিল। তাঁরা একসঙ্গে ছবি তোলার জন্য সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান। তাঁদের সংলাপের কিছু অংশ ছিল এ রকম :

ভুট্টো : শেখ সাহেবকে আমার চেয়ে তরুণ দেখায়।
মুজিব : তবে মি. ভুট্টো বেশি সুদর্শন।
ভুট্টো : তাহলে আপনার উচিত আরও ছাড় দেওয়া।
মুজিব : আমি কোনো ছাড় দেব না।[২৩]

ওপরে ওপরে তাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে যা-ই বলুন না কেন, আলোচনা আসলে এগোচ্ছিল না। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠনের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিল।

ভুট্টো দুটো বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন :

ক) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা; অথবা
খ) জাতীয় পরিষদে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরির বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া।[২৪]

ভুট্টোর মন্তব্য ছিল, তাঁর প্রস্তাব না মানার অর্থ হলো এখানেই গণতন্ত্রের শেষ। ভুট্টোর এ মন্তব্যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেখ মুজিব বলেন, '৮১ জন সদস্য নিয়ে তুমি যদি ১৬৭ জন সদস্যের সঙ্গে সমঝোতায় না আসো, তাহলে তোমরা যেতে পারো। সংবিধান হবে ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে। কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা মরব, তবু আপস করব না।'[২৫]

বিরোধী দলের নেতা হয়ে থাকার মোটেও ইচ্ছা ছিল না ভুট্টোর। কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাবে শেখ মুজিবের মূল সমস্যা ছিল ভুট্টোকে অনেক ছাড় দিতে হতো। এটি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুজনই চাইছিলেন একে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে। পাকিস্তানের ঐক্য রেখে সমস্যা সমাধানের সুযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ইয়াহিয়ার সামনে উভয়সংকট। তিনি দুই পক্ষকেই সমঝোতায় আসার জন্য অবিরাম পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে ভুট্টো কী শর্ত দিয়েছিলেন, এ নিয়ে ভুট্টো ও মুজিব কেউই মুখ খোলেননি। যতটুকু জানা যায়, ভুট্টো নিজে উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতে চেয়েছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভুট্টো মুজিবের কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ছিলেন। ভুট্টো ছিলেন প্রচণ্ড রকম ভারতবিরোধী। অন্যদিকে মুজিব চাইছিলেন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক। মুজিব ভুট্টোকে সামরিক বাহিনীর চর মনে করতেন। কথিত আছে যে মুজিব ভুট্টোকে খুব বেশি হলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে রাজি ছিলেন।[২৬]

এ প্রসঙ্গে রাও ফরমান আলীর ভাষ্য খুব চমকপ্রদ। তাঁর বয়ানে শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

ভুট্টো : পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হবেন। সুতরাং প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই হবেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।

মুজিব : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

ভুট্টো : পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচিত নেতা হিসেবে তাহলে আমাকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নে ক্ষমতা দেওয়া হোক।

মুজিব : না, এটা হবে না। সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের অধিকার একমাত্র আমারই এবং আমি পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই একজনকে বাছাই করব। আমি ইতিমধ্যে প্রার্থী মনোনীত করে ফেলেছি।

ভুট্টো : ধরুন, আমি যদি একই ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিই, যাঁকে আপনিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন।

মুজিব : তাহলেও প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের ক্ষমতা আমি ছেড়ে দিতে পারি না।

শেখ মুজিব পরে ফরমান আলীকে বলেছিলেন, 'ভুট্টোকে ওই ক্ষমতা দিলে সে কী করত; সে নিজেকেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করত এবং দশ দিনের মাথায় আমাকে পদচ্যুত করত।'[২৭]

বঙ্গবন্ধু মাঝেমধ্যে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেন যে তিনি একজন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ, কিন্তু দলের চরমপন্থীরা তাঁকে চাপে রেখেছেন। এ ব্যাপারে জুলফিকার আলী ভুট্টোর অভিমত ছিল বিপরীত। তাঁর মতে, এটি ছিল শেখ মুজিবের একটি কৌশল। জনগণের ওপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। জনতার ওপর যাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য, তিনি কিছুতেই গুটিকয়েক ছাত্রনেতা কিংবা আওয়ামী লীগের পেছনের সারির চরমপন্থীদের হাতের পুতুল হতে পারেন না। শেখ মুজিব সম্বন্ধে ভুট্টো বলেন :

> একাত্তরের জানুয়ারিতে যখন আমি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করি, তখন আমি তাঁকে জানতে ও বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। যেসব বিষয়ে তাঁর দখল আছে, তা নিয়ে তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কথা

বলতেন। যেসব বিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট, তিনি সংক্ষেপে তা শেষ করে দিতেন। বৈশ্বিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা এবং কিছু মৌলিক বিষয় তিনি অতি সরলীকরণ করতেন। আমার মূল্যায়ন ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো পূর্বসংস্কার নেই। যখন তিনি জেলে ছিলেন, আমি কয়েকবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় আমি আদালতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছি।...

শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার নীতিগত মতভেদ আছে। এটি হলো ন্যায্যতার প্রশ্নে আমাদের লড়াই। মুজিবুর রহমানের কাছে ন্যায্যতা হলো স্বাধীন বাংলা; আর আমার কাছে হলো পাকিস্তান রক্ষা করা। তাঁর মতে, ছয় দফা হলো জনগণের সম্পদ, আমার কাছে জনগণের সম্পত্তি হলো পাকিস্তান। এখানেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ।[২৮]

এ সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল, যার সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জানুয়ারির (১৯৭১) চতুর্থ সপ্তাহের শুরুর দিকে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব কেওয়াল সিং দিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দারকে ডেকে বললেন, ভারতের একটি বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হবে বলে তিনি তথ্য পেয়েছেন এবং এ রকম কিছু যদি ঘটে, তাহলে এ জন্য পাকিস্তান দায়ী থাকবে। সাজ্জাদ হায়দার বিষয়টি ইসলামাবাদে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানকে জানালেন। সুলতান খান এই হুঁশিয়ারির পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন, ভারতীয়রা যদি এ রকম খবর পেয়ে থাকে, তাহলে তারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? তিনি বিষয়টি গোয়েন্দা ব্যুরোকে বলেন এবং এ ব্যাপারে তাদের মন্তব্য জানতে চান। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৩০ জানুয়ারি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান 'গঙ্গা' শ্রীনগর থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ছিনতাই হয়ে লাহোরে নামে। সব যাত্রীকে একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এক দিন পর জুলফিকার আলী ভুট্টো বিমানটি দেখতে যান এবং ছিনতাইকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'কাশ্মীরের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম গুলিটি ছোড়া হলো।'[২৯]

বিমান থেকে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর পুলিশি পাহারা ভেদ করে এক ব্যক্তি বিমানে উঠে দুজন ছিনতাইকারীকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি জানি, তোমাদের কাছে কী অস্ত্র আছে।' পরে জানা যায়, তাদের কাছে ছিল একটি খেলনা পিস্তল আর একটি কাঠের তৈরি গ্রেনেড। ওই লোকটির পরিচয় জানার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। ছিনতাইকারী দুজন তৃতীয় দিনে বিমানটিতে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করে দেয়। তারা শুধু মুক্তই ছিল না, তাদের বীরোচিত সংবর্ধনা দিয়ে লাহোরের রাস্তায় মিছিল হয়। সুলতান খান ছিনতাইকারীদের ব্যাপারে তদন্ত করার কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ইন্টার সার্ভিসেস

ইন্টেলিজেন্সকে (আইএসআই) তদন্তের নির্দেশ দেন। আইএসআই কিছুই করেনি। পরে পুলিশের একজন ডিআইজিকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলেও কোনো কাজ হয়নি। পরে জানা যায়, ছিনতাইকারীদের একজন ছিল 'ডাবল এজেন্ট'। কেওয়াল সিংকে সে-ই তথ্য সরবরাহ করেছিল। পরে আরও চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে। কাশ্মীরের নেতা শেখ আবদুল্লাহ ভারতের প্রবীণ রাজনীতিবিদ জয়প্রকাশ নারায়ণকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এ ছাপা হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, প্রধান ছিনতাইকারী ভারতীয় বিএসএফের সদস্য। সে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে ছিনতাইয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। পরে সে আবার বিএসএফে যোগ দেয়। সে বিমানবন্দরেই ডিউটিতে ছিল। কাশ্মীরের পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিএসএফ তাকে কাশ্মীরের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেনি। সে একজন সঙ্গী নিয়ে ওই বিমানে ওঠে এবং তা ছিনতাই করে। বিষয়টি বিএসএফের জানার মধ্যেই ছিল।[৩০]

ছিনতাইয়ের পরপরই ভারত ঘোষণা দেয়, কাশ্মীরি সন্ত্রাসীরা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজশ করে কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ভারত তার আকাশসীমার ওপর দিয়ে পাকিস্তানের সব ধরনের বিমানের ওড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ব্যাপারটির সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। করাচি থেকে ঢাকায় সরাসরি উড়ালপথে তিন ঘণ্টার যাত্রা এখন কলম্বো হয়ে সাত ঘণ্টা লাগে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা ও অস্ত্র পাঠানো কঠিন হয়ে পড়ে।[৩১]

ঘটনাপ্রবাহ দেখে মনে হয়, ছিনতাই নাটকটি ছিল সাজানো। ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ভারত সামরিক কৌশলগত বিরাট সুবিধা পায় এবং পাকিস্তান মারাত্মক অসুবিধার মধ্যে পড়ে। একটি যুদ্ধ যে আসন্ন, তার প্রস্তুতি হিসেবেই এই ছিনতাইয়ের ব্যাপারটি বিবেচিত হয়। তড়িঘড়ি করে বিমানটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভুট্টোর উসকানি ছিল সন্দেহজনক। মনে হয়, ভারত আর পাকিস্তান কোনো ছুতোনাতায় একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক, ভুট্টো এটিই চেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সিন্ধু হাইকোর্টের বিচারপতি আরেফিনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভারতীয় গোয়েন্দারাই বিমানটি ছিনতাই করেছিল।[৩২]

ঢাকার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সরাসরি বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সামর্থ্য মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে দেরি হওয়ায় ধারণা হলো যে সামরিক জান্তা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডাকার ছুতো

খুঁজছে। এ পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ড. কামাল হোসেনের কাছ থেকে।

ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই দলের নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করেছিলেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেছিলেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণাকে একটি বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়েছিল। এ ঘোষণার সামরিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে এবং আক্রান্ত হলে জনগণের তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আছে কি না, তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ করা হয়েছিল। এই হিসাবের ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনীর ওই সময়ের সামর্থ্য। ঢাকার সঙ্গে সরাসরি বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তানি সামরিক শক্তি যে বাড়ানো কঠিন, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়। কামাল হোসেন বলেছেন :

> স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। আমি তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শ অনুযায়ী খসড়া তৈরি করি। খসড়ায় আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণ হিসেবে ব্রিটিশ রাজের অবিচারের কথা বলা হয়েছিল। তাজউদ্দীন ভাইকে কাছে রেখে মতিঝিলে আমার শরীফ ম্যানশনের অফিসে আমি দুদিন কাজ করি। ঘোষণাপত্রটি আমি নিজেই টাইপ করি। খুব গোপনে এটি করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি আমরা এটি বঙ্গবন্ধুর হাতে দিই এবং তিনি এটি তাঁর কাছে রেখে দেন। তাজউদ্দীন আহমদ শুধু খসড়া তৈরিতেই অংশ নেননি, ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের একটি কর্মসূচিও তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচিতে প্রধান প্রধান শহরে মহাসমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে রাজপথে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়। সামরিক বাহিনী এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমরা রেডিও স্টেশন, সচিবালয় ও গভর্নর হাউসের দখল নিয়ে নেব এবং গভর্নর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হবেন।
>
> আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার দাবি করে আসছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও কার্যকরী কমিটির সদস্যদের একটি সভা ডাকা হয়। সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানানো হয়। মনে হয়েছিল, ওই সভায় স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। আমার মনে আছে, এক বিদেশি কূটনীতিক আমাকে আগের দিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনারা কি এই সভায় একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন?'
>
> জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে দেরি হওয়ায় জনমনে ক্ষোভ বাড়ছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভা হওয়ার কথা, ওই দিন

সকালে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।[৩৩]

পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ সদস্য ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু ভুট্টো জানিয়ে দেন, তিনি বা তাঁর দল অধিবেশনে যোগ দেবে না। কাইয়ুম খানের মুসলিম লীগও একই সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এটি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সমঝোতার আশা খুব ক্ষীণ। ইয়াহিয়া তাঁর অসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। গভর্নর আহসান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন। সিদ্ধান্ত হলো, তাঁর বদলে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হবে। লে. জেনারেল ইয়াকুব খান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অপারেশন ব্লিৎস' নামে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। তবে তিনি মনে করতেন, সামরিক পদ্ধতিতে এ পরিস্থিতির সমাধান হবে না। এর সঙ্গে যুগপৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকতে হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দিয়ে তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।[৩৪]

এটি ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল যে শেখ মুজিব ছয় দফার ব্যাপারে কোনো আপস করবেন না। পক্ষান্তরে ভুট্টো, ইয়াহিয়া এবং তাঁর সামরিক জান্তার কাছে ছয় দফা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এত দিন ইয়াহিয়া মনে করেছিলেন, মুজিব ছয় দফা পরিমার্জন করবেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাঁর সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

১৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নেতা নির্বাচন করা হয়। উপনেতা নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে সংসদীয় দলের সম্পাদক করা হয়। এ ছাড়া অধ্যাপক ইউসুফ আলী (দিনাজপুর) চিফ হুইপ এবং আব্দুল মান্নান (টাঙ্গাইল) ও আমীর-উল-ইসলাম (কুষ্টিয়া) হুইপ নির্বাচিত হন। জল্পনা ছিল যে খন্দকার মোশতাক আহমদকে জাতীয় পরিষদের স্পিকার করা হতে পারে। মোশতাক অবশ্য মন্ত্রিসভায় থাকতে ইচ্ছুক, কেননা স্পিকার হলে তিনি আর দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবেন না। এ ছাড়া দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী করা হতে পারে। প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভায় কর্নেল ওসমানী, মশিউর রহমান, কামারুজ্জামান, এম আর সিদ্দিকী, ড. কামাল হোসেন ও মুহম্মদ ইদ্রিস স্থান পেতে পারেন। আবদুল মালেক উকিলকে ডেপুটি স্পিকার করা হতে পারে।[৩৫]

ইয়াহিয়া মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার পর রাওয়ালপিন্ডিতে একটি বিদায়ী নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। এ সময় সবাই হালকা মেজাজে কথাবার্তা বলছিলেন। একপর্যায়ে জেনারেল হামিদ অধ্যাপক জি. ডব্লিউ চৌধুরীকে বলেন, 'আমার ছেলেরা ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে, তারা চায় অ্যাকশন।' অধ্যাপক চৌধুরী এর বিপজ্জনক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলে হামিদ বলেন, 'আমি বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সব ঠান্ডা করে দিতে পারি।' ১৯ ফেব্রুয়ারি পীরজাদা ও রাও ফরমান আলী ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করলে ইয়াহিয়া তাঁদের বলেছিলেন, 'আমি বদমাশটাকে শায়েস্তা করে ছাড়ব।' ফরমান আলী মুজিবের সঙ্গে সংঘাত থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ইয়াহিয়াকে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করেছিলেন। ইয়াহিয়া তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না, আমার ভিত্তি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। আমাকে এর দেখভাল করতে হবে।'[৩৬]

পিপলস পার্টির নেতারা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রচার করছিলেন। ইরানের *দৈনিক কিহান*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেন, যারা তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলছে, তারা ছোট মনের মানুষ এবং তারা জঘন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি ঐক্য ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমগ্র পাকিস্তানের উন্নতি চান। পাকিস্তান একটি ফেডারেশন হলে ভারত বাংলাদেশকে গিলে ফেলবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'আজকের দুনিয়ায় কেউ কাউকে খেতে পারে না। ভারত তো তার "বাংলা" নিয়েই সমস্যায় আছে। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারব। ভিয়েতনামের দিকে তাকিয়ে দেখুন। গরিব কৃষকদের একটি দেশের ওপর মতামত চাপিয়ে দিতে গিয়ে পরাক্রমশালী যুক্তরাষ্ট্রের কেমন বেহাল দশা হয়েছে? আমেরিকা যদি ভিয়েতনামকে গিলতে না পারে, তাহলে ভারত কীভাবে বাংলাদেশকে গিলে খাওয়ার স্বপ্ন দেখে?' শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চান। তিনি বলেন, 'আমরা একই উপমহাদেশের বাসিন্দা। আমরা চাই বা না চাই আমাদের একসঙ্গে থাকতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে।' চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে এ প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'ভূগোল ও রাজনীতির ওপর বন্ধুতা নির্ভর করে। তার মানে এই নয় যে আমরা আমাদের ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করব না। আমরা মুসলমান এবং কখনোই কমিউনিজম গ্রহণ করব না।' ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে মন্তব্য করে মুজিব বলেন, 'এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার দরকার নেই। ইরান হলো আমাদের সবচেয়ে কাছের মুসলমান রাষ্ট্র এবং আমাদের দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে কেউ বিভেদ তৈরি করতে পারবে না।'[৩৭]

ঢাকায় আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ভুট্টোর আগ্রহ ছিল না। ২০-২১ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পিপলস পার্টির জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের এক সভায় ভুট্টো অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার প্রস্তাব করলে সবাই তাতে সায় দেন।[৩৮]

ইয়াহিয়া যখন বুঝতে পারলেন, ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না, তিনি ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রাদেশিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের একটি সভা ডাকেন। সভায় জেনারেল হামিদ ও পীরজাদা উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় ইয়াহিয়া চলমান অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রস্তাব দেন। গভর্নর আহসান ও জেনারেল ইয়াকুব এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, এর ফল হবে খুব খারাপ। ইয়াহিয়া বললেন, 'তাহলে আপনারা ভুট্টোকে রাজি করান, সে যেন অধিবেশনে যোগ দেয়।' আহসান ও ইয়াকুব করাচি গেলেন। কিন্তু ভুট্টোকে রাজি করাতে পারলেন না। তাঁরা রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে এলেন। ইয়াহিয়া তাঁদের বললেন মুজিবকে জানাতে যে অধিবেশন স্থগিত করা হচ্ছে। কথাটি যেন ২৮ ফেব্রুয়ারি জানানো হয়, তার আগেও নয় পরেও নয়।[৩৯]

২৮ ফেব্রুয়ারি আহসান, ইয়াকুব ও ফরমান আলী শেখ মুজিবের সঙ্গে গভর্নর হাউসে দেখা করেন। ওই সময় তাজউদ্দীন শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলেন। খবরটি শুনেই মুজিব উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি তাজউদ্দীনকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেন। তাজউদ্দীন কক্ষ ছেড়ে চলে যান। মুজিব তাঁদের বলেন, তিনি দলে চরমপন্থীদের নিয়ে খুবই মুশকিলে আছেন। যদি অধিবেশন স্থগিত করতেই হয়, একই সঙ্গে নতুন একটি তারিখ যেন অবশ্যই ঘোষণা করা হয়। তাহলে তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।[৪০]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য নতুন একটি তারিখ চেয়ে শেখ মুজিব সংঘাত এড়াতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ফরমান আলীর মন্তব্য হলো, মুজিব যদি বিচ্ছিন্নতা চাইতেন তাহলে অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্ত তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত অজুহাত তৈরি করতে পারত। তিনি এটি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু নতুন একটি তারিখের জন্য অনুরোধের অর্থ হলো, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। ফরমান আলীর মতে, 'এই একটি ঘটনা থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, শেখ মুজিব পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর যদি খারাপ মতলব থাকত, তাহলে নতুন তারিখ কেন চাইতে যাবেন তিনি?'[৪১]

গভর্নর এস এম আহসানের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা বিবরণে ওই সময়ের উত্তপ্ত পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায় রিচার্ড সিসন ও লিও রোজের

গবেষণা গ্রন্থে। বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন চলে যাওয়ার পর কী করা যায় তা নিয়ে গভর্নর আহসান, জেনারেল ইয়াকুব ও রাও ফরমান আলী নিজেদের মধ্যে কথা বলেন। রাত নয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত তাঁরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেন। ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত স্টাফ আহসানকে করাচিতে ফোন করে ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। আহসান করাচিতে ফোন করে জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান মেজর জেনারেল গোলাম উমরের সঙ্গে কথা বলেন। উমর জানান, প্রেসিডেন্ট অন্য কাজে ব্যস্ত; তবে তিনি আহসানের বার্তাটি প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দেবেন। এরপর আহসান জেনারেল হামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হামিদ তখন পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে। আহসান হামিদকে অনুনয় করে বলেন, প্রেসিডেন্টকে যেন জানানো হয় পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। জবাবে হামিদ বলেন, রাজনীতি তিনি বোঝেন না, তবে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন। এরপর আহসান করাচিতে ইয়াহিয়ার কাছে একটি টেলেক্স বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি লেখেন, 'আই বেগ ইউ ইভেন অ্যাট দিস লেট আওয়ার টু গিভ আ নিউ ডেট ফর সামোনিং অব দ্য অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড নট টু পস্টপন ইট সাইনে ডাই, আদার ওয়াইজ...উই উইল হ্যাড রিচড দ্য পয়েন্ট অব নো রিটার্ন।' (এত রাতে আমি অনুনয় করছি, অধিবেশন বসার নতুন একটি তারিখ দিন এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করবেন না, নইলে আমরা এমন জায়গায় চলে যাব, যেখান থেকে আর ফেরা যাবে না)।[৪২]

ফেব্রুয়ারিতে পরিস্থিতির যখন অবনতি হচ্ছিল, শেখ মুজিব তখন সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য মার্কিন প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছিলেন। ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কেন্ট ব্লাডের সঙ্গে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করতেন মার্কিন তেল কোম্পানি এসোর (ESSO) পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার আলমগীর রহমান।[৪৩] আলমগীরকে দিয়ে মুজিব বার্তা পাঠান, বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবে কি না। আর্চার ব্লাড জানিয়ে দেন যে তাঁর সরকার চায় পাকিস্তানের ঐক্য টিকে থাকুক এবং সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করার সুযোগ আছে। মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করা হবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার শামিল এবং এটি উচিত হবে না। ১২ ফেব্রুয়ারি স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো এক বার্তায় রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, 'কনস্যুলেট জেনারেল আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিকে মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে অপারগতা জানিয়ে ঠিক কাজটি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের কোনো অংশের বিচ্ছিন্নতা চায় না এবং পাকিস্তান টিকে থাকুক এটিই আশা করে। আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে,

যাতে করে আমাদের কোনো কাজে কোনো পক্ষ মনে করতে না পারে যে আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।'[৪৪]

বৈরুতের *টাইম লাইফ*-এর সংবাদদাতা ভ্যান কগিন ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে আর্চার ব্লাডের সঙ্গে দেখা করেন। আগের দিন বিকেলে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর এক ঘণ্টা কথাবার্তা হয়। মুজিব তাঁর মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব জানতে চান, ছয় দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান গ্রহণ করতে ইয়াহিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র চাপ প্রয়োগ করতে রাজি হবে কি না। এটি যদি না হয়, তাহলে একজন নামমাত্র প্রেসিডেন্টের অধীনে দুটি সংবিধানের মাধ্যমে দুটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান একটি কনফেডারেশন হিসেবে থাকুক। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়াকে রাজি করাবে কি না। ভ্যান কগিনের ওই দিনই মুজিবের কাছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের জবাব পৌঁছে দেওয়ার কথা। আর্চার ব্লাড তাঁর আগের অবস্থানটাই আবার তুলে ধরেন, যা তিনি এর আগে আলমগীর রহমানকে বলেছিলেন।[৪৫]

বঙ্গবন্ধু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসা চেয়েছিলেন। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বেশ খোলামেলাভাবেই বলেন :

> পশ্চিম পাকিস্তানিরা কি জানে না যে কেবল আমিই পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিজম থেকে বাঁচাতে পারি? তারা যদি যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমি ক্ষমতা হারাব এবং নকশালপন্থীরা (মাওবাদী) আমার নামে ঢুকে পড়বে। যদি বেশি ছাড় দিই, আমি আমার কর্তৃত্ব হারাব। আমি একটি কঠিন সংকটে পড়েছি।[৪৬]

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লে. জেনারেল গুল হাসান খানকে বিমানযোগে ঢাকায় পাঠানোর জন্য সাঁজোয়া কিংবা অন্য ভারী সরঞ্জাম ছাড়া দুই ডিভিশন সেনা স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখতে বলেন। কাদের পাঠাতে হবে, তা-ও তিনি বলে দেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সেনা পাঠানো শুরু হয়।[৪৭]

২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ধানমন্ডির বাসায় দেখা করেন। তাঁদের মধ্যকার বৈঠকের যে বিবরণী ফারল্যান্ড তৈরি করেছিলেন, সেখানে জটিলতার অবসান হবে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শেখ মুজিব ফারল্যান্ডকে বলেন যে বাংলাদেশের মানুষ তাঁর পেছনে এককাট্টা। তবে কিছু চরমপন্থী কমিউনিস্ট আছে। তারা ইতিমধ্যে তাঁর তিনজন নেতাকে হত্যা করেছে। তিনি এর বদলা নিতে বলেছেন। তাঁর একজনকে মারলে তিনজন কমিউনিস্টকে মারা হবে এবং এটি বাস্তবায়িত

হয়েছে। তিনি অনেক বছর পাকিস্তানের জেলে বন্দী ছিলেন। যদি দেশের ঐক্য ধরে রাখা না যায়, তাহলে গুলির মুখোমুখি হতে তিনি পিছপা হবেন না। তাঁকে যদি আবারও জেলে নেওয়া হয় কিংবা যদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, তবুও তিনি জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেট থেকে সরে আসবেন না। তিনি বিচ্ছিন্নতা চান না, তিনি চান একটি কনফেডারেশন, যেখানে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা পাবে। মুজিব সাবধানে কথা বলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার কথা এড়িয়ে

DECLASSIFIED
NND 969042

Department of State TELEGRAM

CONFIDENTIAL

PAGE 03 DACCA 00540 01 OF 02 010840Z

TRADE ROUTES IN THE AREA. HE OPINED THAT DIFFERENCES BETWEEN WHAT BHUTTO WANTED AND WHAT THE PEOPLE OF BANGLA DESH DEMANDED APPEARED TO BE INSURMOUNTABLE.

5. WITH THE CONCEPT AS POINT OF DEPARTURE, SHEIKH INDULGED IN A 10-MINUTE SPEECH WHICH COULD HAVE BEEN A PART OF HIS POLITICAL ORATORY, SAYING THAT THE PEOPLE OF "HIS COUNTRY," WERE BEHIND HIM TO A MAN, THAT HE HAD THE SMALL HARD CORE OF COMMUNISTS VERY MUCH ON THE RUN AS WAS EVIDENCED BY BHASHANI'S PRESENT POLITICAL DISARRAY. HE SAID THAT THE COMMUNISTS HAD KILLED THREE OF HIS LEADERS AND THAT HE IN TURN HAD PROMISED THE COMMUNISTS THAT FOR EVERY AWAMI LEAGUER KILLED, HE WOULD KILL THREE OF THEIRS AND THAT "THIS WE HAVE DONE." AFTER NOTING THE TIME HE HAD SPENT IN PRISON AT HANDS OF WEST PAKISTANI LEADERSHIP, HE SAID THAT HE HAD NO FEAR WHATSOEVER OF "FACING THE BULLET" IF UNITY COULD NOT BE MAINTAINED. HE DRAMATICALLY POINTED OUT THAT HE WAS UNAFRAID OF BEING JAILED OR "HACKED TO PIECES," AND THAT HE WOULD NOT DEVIATE FROM THE MANDATE WHICH HAD BEEN THE WILL OF HIS PEOPLE. HE CULMINATED THIS MONOLOGUE BY SAYING THAT HE DID NOT WANT SEPARATION BUT RATHER HE WANTED A FORM OF CONFEDERATION IN WHICH THE PEOPLE OF BANGLA DESH WOULD GET THEIR JUST AND RIGHTFUL SHARE OF FOREIGN AID, AND NOT A MERE "20 PERCENT AS HERETOFORE. WITH 60 PERCENT OF FOREIGN EXCHANGE COMING FROM MY COUNTRY, HOW CAN ISLAMABAD JUSTIFY THE CRUMBS WHICH THEY HAVE THROWN US?," THE SHEIKH RHETORICALLY ASKED.
BLOOD

CONFIDENTIAL

DECLASSIFIED
PA/HO, Department of State
E.O. 12958, as amended
June 9, 2005

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনার বিষয়ে ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের টেলিগ্রামের একটি পৃষ্ঠা। সূত্র : খসরু

যান। মুজিব ততক্ষণে বুঝে গেছেন একটি ঝড় ক্রমেই এগিয়ে আসছে। মুজিব ভুট্টোর ক্ষমতাকে খুব খাটো করে দেখেছিলেন। এই সভার পরপরই ফারল্যান্ড চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে চলে যান। ওই দিন বিকেলেই ভুট্টো ঘোষণা করেন, তিনি খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত দেশ অচল করে দেবেন।[৪৮]

১ মার্চ বেলা একটায় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। রেকর্ডকৃত ঘোষণাটি প্রেসিডেন্টের নামে পাঠ করা হলেও প্রেসিডেন্ট এতে কণ্ঠ দেননি। বেতার ঘোষণার অংশবিশেষ ছিল এ রকম :

> বিগত কয়েক সপ্তাহে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পরিবর্তে আমাদের কোনো কোনো নেতা অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন। এটি দুর্ভাগ্যজনক। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক মোকাবিলা একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।...সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে।
>
> অতএব, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে শাসনতন্ত্র কোনো সাধারণ আইন নয়, বরং এটি হচ্ছে একত্রে বসবাস করার একটি চুক্তিবিশেষ। অতএব, একটি সুষ্ঠু ও কার্যকর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের পর্যাপ্ত অংশীদারি থাকা প্রয়োজন।...শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যুক্তিসংগত সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত। এ সময় দেওয়ার পর আমি একান্তভাবে আশা করি যে তাঁরা একে কাজে লাগাবেন এবং সমস্যার একটি সমাধান বের করবেন। আমি পাকিস্তানি জনগণকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অনতিবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে কোনোরূপ ইতস্তত করব না।[৪৯]

পরিস্থিতি যে দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে, আর্চার ব্লাডের তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেট থেকে পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, ঘূর্ণিঝড়ের আগে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় থাকার সম্ভাবনা ছিল ৫০ : ৫০। নির্বাচনের পর এ সম্ভাবনা ঐক্যের বিরুদ্ধে ৭৫ : ২৫ অনুপাতে হেলে পড়ে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়ার পর ঐক্যের সম্ভাবনা এখন ০ : ১০০।[৫০]

ইয়াহিয়া খানের ১ মার্চের ঘোষণার পটভূমি সম্পর্কে তাঁর উপদেষ্টা অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরীর একটি ভাষ্য পাওয়া যায়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার জন্য তাঁর ওপর ভুট্টো ও পীরজাদার চাপ ছিল। ইয়াহিয়া করাচিতে ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়ার আগে অধ্যাপক চৌধুরীকে অধিবেশন স্থগিতের কারণ ব্যাখ্যা করে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত ভাষণের একটি খসড়া তৈরি করতে বলেন। চৌধুরী বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে নরম সুরে একটি খসড়া তৈরি করেন। খসড়ায় তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং অধিবেশন বড়জোর দু-তিন সপ্তাহ স্থগিত থাকবে। ইয়াহিয়ার একটি দুর্বলতা হলো, তিনি একেক সময় একেক রকম সিদ্ধান্ত নিতেন। ইয়াহিয়ার সামরিক সচিবের কাছে চৌধুরী জানতে পারেন, তাঁর খসড়াটি বাদ দিয়ে তিনি ভুট্টো-পীরজাদার তৈরি ভাষণের খসড়াটি গ্রহণ করেছিলেন। ১ মার্চ এটিই রেডিওতে পাঠ করা হয়। বরাবর ইয়াহিয়া স্বকণ্ঠে পাঠ করলেও এবার অন্য একজন তাঁর ঘোষণাটি পড়ে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, '৫ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উদাস চোখে তাকিয়েছিলেন। তাঁকে অসহায় মনে হলো। আমার মনে হলো, ভুট্টো ও পীরজাদার তৈরি এই ঘোষণায় সই দিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।'[৫১]

# অপারেশন সার্চলাইট

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে জেনারেল ইয়াহিয়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং সামরিক অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবেছিলেন। এই ভাবনা থেকেই তৈরি হয় 'অপারেশন ব্লিৎস'। এর উদ্দেশ্য ছিল কঠোরভাবে সামরিক আইন কার্যকর করা। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ও গভর্নর এস এম আহসান রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্টের ডাকা একটি বৈঠকে অংশ নিয়ে ঢাকায় আসেন ২৫ ফেব্রুয়ারি। ২৬ ফেব্রুয়ারি সেনা কর্মকর্তাদের এক সভায় ইয়াকুব খান বলেন, ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করবেন এবং তখন থেকেই অপারেশন ব্লিৎস কার্যকর হবে। গভর্নর আহসান এ পরিকল্পনার সাথে একমত ছিলেন না এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত না করার জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল এবং তিনি গভর্নর আহসানকে বরখাস্ত করে ইয়াকুব খানকে আঞ্চলিক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বের পাশাপাশি গভর্নরের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। ইয়াকুব খানের প্রধান সহকারী ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা অন্যান্য সেনা কর্মকর্তার সাথে আলাপ করার পর উপলব্ধি করলেন, অপারেশন ব্লিৎস হবে নিছক পাগলামি। এদিকে ইয়াকুব খান বারবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ঢাকায় আসার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ছিলেন নির্লিপ্ত। ইয়াহিয়া আহসানের জায়গায় লে. জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। ইয়াকুব খান পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।[১]

১ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিব পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের অফিসে বসে দুপুর দুইটায় রেডিওতে প্রচারিত সংবাদ বুলেটিনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা শোনেন।[২] এই ঘোষণা শোনামাত্রই ঢাকার রাজপথে সর্বস্তরের মানুষ নেমে এলেন। বেলা তিনটায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের

পার্লামেন্টারি পার্টির সভা হওয়ার কথা ছিল। জাতীয় পরিষদের সদস্যরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি পরদিন ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল ডাকেন।

নওয়াবপুর, জিন্নাহ অ্যাভিনিউ ও বায়তুল মোকাররম এলাকায় কাপড়ের ও ঘড়ির কয়েকটি দোকান, দুটি বন্দুকের দোকান এবং একটি মদের দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। জিপিওর উল্টোদিকে 'গ্যানিজ' নামের একটি বড় কাপড়ের দোকান ছিল। দোকানটির মালপত্র প্রায় সবই লুট হয়ে যায়। অবাঙালি মালিকদের দোকানগুলোই ছিল আক্রমণের লক্ষ্য।

বিকেলে ছাত্রলীগের একক নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর চারজন প্রধান নেতা ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন। প্রায় সব ব্যানার ও সাইনবোর্ড থেকে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান শব্দগুলো মুছে ফেলা শুরু হয়।

১ মার্চ দুপুরে আওয়ামী লীগ অফিসে রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের সংবাদ শুনছেন শেখ মুজিব। সঙ্গে তাজউদ্দীন। পেছনে দাঁড়ানো জাতীয় পরিষদের মহিলা সদস্যবৃন্দ: (ডান থেকে) নূরজাহান মুরশিদ, রাফিয়া আক্তার ডলি, সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম, বদরুন্নেসা আহমদ, রাজিয়া বানু ও তসলিমা আবেদ

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে ২ মার্চ আ স ম আবদুর রব বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে সূর্য সেন হল এবং ইকবাল হলের নাম পাল্টে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল রাখলেন। নাম পাল্টানো চলল সর্বত্র। জিন্নাহ অ্যাভিনিউ হলো বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, মহাখালীর জিন্নাহ কলেজ হলো তিতুমীর কলেজ, পুরান ঢাকার কায়েদে আজম কলেজ হলো সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পাক মোটর হলো বাংলা মোটর।

১ মার্চ রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম-সংলগ্ন ইউওটিসির স্টোররুমের তালা ভেঙে ডামি রাইফেল লুট করা হলো। পরে সেসব রাইফেল হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কয়েক দিন প্যারেড করলেন, ছবি তুললেন।

২ মার্চ রাতে ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। অনেক জায়গায় জনতা সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে মিছিল বের করে। সর্বত্র সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে। ৩ তারিখ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর গুলিতে ১৬ জন নিহত হন।[৩]

৩ মার্চ ছাত্রলীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে শাজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। এটাই ছিল প্রকাশ্যে দেওয়া স্বাধীনতার প্রথম লিখিত ঘোষণাপত্র, যদিও তা ছিল অনানুষ্ঠানিক। ইশতেহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৪] ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে 'বঙ্গভঙ্গের' প্রতিবাদ সভায় গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল।[৫] সাড়ে ছয় দশক পরে এই গানেই 'ভঙ্গবঙ্গের' সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ পেল। জনসভার প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো 'জাতির পিতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ছাত্রলীগের সহদপ্তর সম্পাদক রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাকের হাতে লেখা প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন দপ্তর সম্পাদক এম এ রশিদ।

প্রদেশে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সব অফিস-আদালত বন্ধ। পিআইএর বাঙালি কর্মচারীরা কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে টেলিযোগাযোগও প্রায় বিচ্ছিন্ন। একদিকে সামরিক আইনবিধি জারি হচ্ছে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ জারি করছে প্রশাসনিক নির্দেশনামা। ইয়াহিয়া ৩ মার্চ ঘোষণা দিলেন, তিনি ঢাকায় ১০ মার্চ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, বন্দুকের নল দেখিয়ে এ বৈঠক ডাকা হয়েছে। সুতরাং এতে অংশ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

২ মার্চের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় সেনাবাহিনীর দুই

# পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

কেন্দ্রীয় সংসদ

৪২, বলাকা ভবন
ঢাকা-২

ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভা
পল্টন/ প্রস্তাবাবলি

তাং ৩।৩।৭১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ১। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। এই পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তির সেনাবাহিনীর এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে।

২। এই সভা অত্যাচারী সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙালী ভাইদেরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে ব্লাডব্যাংকে রক্ত প্রদানের আহবান জানাইতেছে।

৩। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলার দেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলা দেশে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সকল [illegible] সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানাইতেছে।

৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলি। ৪ নম্বর প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে প্রথমবারের মতো 'জাতির পিতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়

ব্যাটালিয়নের একটি ব্রিগেড পাঠানোর কাজ শেষ হয়। ২ ও ৩ মার্চ জনতার সঙ্গে সেনাদের সংঘর্ষে অনেকেই হতাহত হন। শেখ মুজিব পূর্বাঞ্চল কমান্ডকে হুমকি দেন, ঢাকা শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে, নইলে তাঁর অনুগামীরা সেনাদের মোকাবিলা করবে। ঢাকায় সেনা পাঠানো স্থগিত রাখা হয়। জেনারেল গুল হাসানের মন্তব্য ছিল, শেখ মুজিব সেনাদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ ঘটিয়ে সেনা পাঠানো বন্ধ করিয়েছেন এবং 'ঢাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বটা অতঃপর তাঁরই হয়ে যায়'।[৬]

ইয়াহিয়া রাও ফরমান আলীকে রাওয়ালপিন্ডিতে ডেকে পাঠালেন। রওনা হওয়ার আগে ফরমান আলী শেখ মুজিবের মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। ৩ মার্চ রাত ১১টায় শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় দুজনের সাক্ষাৎ হলো। ফরমান আলীর সঙ্গে শেখ মুজিবের কথোপকথন ছিল এ রকম :

রাও : অনুগ্রহ করে বলুন, পাকিস্তানকে কি রক্ষা করা যায়?

মুজিব : হ্যাঁ যায়, যদি আমাদের কথা কেউ শোনে। সেনাবাহিনীর হাতে অনেক মানুষ নিহত হয়েছে। তারা শুনছে ভুট্টোর কথা। তারা আজ অবধি আমার সঙ্গে কথা বলেনি। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও আমরা আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

এ সময় তাজউদ্দীন ঘরে প্রবেশ করলে শেখ মুজিব রাও ফরমান আলীর 'পাকিস্তান রক্ষা পাবে কি না' এই জিজ্ঞাসার ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। তাজউদ্দীন বললেন, 'হ্যাঁ, রক্ষা পেতে পারে, তবে নতুন এক ফর্মুলায়। এত নৃশংসতার পর ভুট্টোর সঙ্গে এক ছাদের নিচে আমরা আর বসতে পারি না। কারণ, বাঙালিদের চোখে সে হলো "মার্ডারার নম্বর ওয়ান" (এক নম্বর খুনি)। ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলা যায়, যদিও সে "মার্ডারার নম্বর টু" (দুই নম্বর খুনি)। পরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ নিয়ে "ভেটো" দেওয়ার কারণে ভুট্টোর সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাওয়া আর সম্ভব নয়। সবকিছুর জন্য সে দায়ী। জাতীয় পরিষদ দুই ভাগ হয়ে যাক, একটি পূর্ব আরেকটি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। প্রতিটি পরিষদ তার নিজ অংশের জন্য সংবিধান তৈরি করুক। পরে দুই পরিষদ একসঙ্গে বসে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান লিখতে পারে।' রাও ফরমান আলীর ধারণা হলো, এটি একটি কনফেডারেশনের ফর্মুলা, ফেডারেশনের নয়।[৭]

পাকিস্তানে নিযুক্ত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা আর্নল্ড জেটলিন শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাডকে বলেছিলেন, মুজিব ও ভুট্টো দুজনই পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য আলাদা সংবিধান, দুজন দুই অংশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া এবং কেন্দ্রের সঙ্গে উভয় অংশের সম্পর্কের বিষয়টি দর-কষাকষির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। খসড়া প্রতিবেদনটির একটি কপি শেখ মুজিবকে দেওয়া হয়েছিল। ৪ মার্চ সন্ধ্যায় জেটলিন শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে মুজিব বলেন, দুই সংবিধান-সংক্রান্ত সমাধানের বিষয়টি তাঁকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা জেটলিনকে বলেন, এটি প্রচারিত হলে দলের কাছে মুজিবের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। জেটলিন অতঃপর বার্তা পাঠান, প্রতিবেদনটি যেন প্রচার না করা হয়।[৮]

৪ মার্চ রাও ফরমান আলী ঢাকা থেকে রওনা হন। লাহোর থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পথে তিনি জেনারেল টিক্কা খানকে একই বিমানের জন্য অপেক্ষা করতে দেখেন। তিনি টিক্কা খানকে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত

করলে টিক্কা জবাব দেন, তিনি পরিস্থিতি সামাল দেবেন।

ইয়াকুব খান ৪ মার্চ ঢাকার রাস্তা থেকে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেন। কার্যত ওই দিনই তিনি বাংলাদেশে 'পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব' ছেড়ে দেন। ৫ মার্চ তিনি ইয়াহিয়ার কাছে পূর্বাঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের পদ থেকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'সামরিক ব্যবস্থা মীমাংসার কোনো পথ নয়।'[৯]

৫ মার্চ সকালে ফরমান আলী ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে চান। তাঁকে ইয়াহিয়ার বাসভবনে আসতে বলা হয়। সেখানে পৌঁছে ফরমান আলী দেখলেন, ইয়াহিয়া বারান্দায় খালি পায়ে বসে জেনারেল হামিদ ও ভুট্টোর সঙ্গে মদ পান করছেন। তখন বেলা ১১টা বাজে। ফরমান আলী ইয়াহিয়াকে বলেন, তিনি প্রেসিডেন্টকে একাকী কিছু বলতে চান, কেননা এসব কথা ভুট্টোর জন্য বিব্রতকর হতে পারে। ভুট্টো পাশের কামরায় চলে যান। ফরমান আলী ইয়াহিয়াকে মুজিবের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বৃত্তান্ত খুলে বলেন। ইয়াহিয়া জবাব দেন, 'আগামীকাল আমার ভাষণে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সব জবাব দিয়ে দেওয়া হবে।'[১০]

৬ মার্চ সানাউল হকের নেতৃত্বে সচিবালয়ের অসামরিক কর্মকর্তাদের একটি দল বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী চলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। তাজউদ্দীন আহমদ, আমীর-উল-ইসলাম ও কামাল হোসেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিদিন বৈঠক করে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করতেন। পরবর্তী দিনগুলোয় তাঁরাই প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু (নিউক্লিয়াস) হয়ে উঠেছিলেন।[১১]

৬ তারিখেই বঙ্গবন্ধুর বাসায় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় পরদিন অনুষ্ঠেয় জনসভার ভাষণের বিষয়বস্তু কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। দলের তরুণেরা চাইছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হোক। তাঁদের কাছে স্বাধীনতার কোনো বিকল্প গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা নিয়ে শেখ মুজিবকে অনেক ভাবতে হয়েছে। শেখ মুজিব দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে আলাদা করে বসলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। বৈঠকে কামাল হোসেনকেও থাকতে বলা হয়। আলোচনা হয় যে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সামরিক বাহিনী হামলা করার অজুহাত পেয়ে যাবে। সুতরাং এটি করা ঠিক হবে না। বরং ইয়াহিয়ার ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করেন।

একই সঙ্গে স্বাধীনতার পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত হলো, সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনা আনা বন্ধ করা, হতাহতের ঘটনার তদন্ত করা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামরিক আইন তুলে নেওয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাতে হবে। এসব দাবিসহ দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে কামাল হোসেনকে একটি খসড়া বিবৃতি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৭ মার্চের জনসভার পর এই বিবৃতি সাংবাদিকদের দেওয়া হবে এমন সিদ্ধান্ত হয়। শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ী বিবৃতিটি তাজউদ্দীনের কাছে রাখা হয়, যাতে জনসভার পর শেখ মুজিবের ভাষণ অনুযায়ী প্রয়োজনে এই বিবৃতি সংশোধন বা পরিবর্তন করে তাজউদ্দীন এটি সাংবাদিকদের দিতে পারেন।[১২]

৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, যার ফলে চরমপন্থীরা উৎসাহিত হবে এবং তারা রাস্তায় বের হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করবে। ইয়াহিয়া আরও বলেন, তিনি পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সময় চান এবং ২৫ মার্চ অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ভাষণে ধমকের সুর প্রচ্ছন্ন ছিল। ভাষণে তিনি বলেন :

> আমি যতক্ষণ রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান আছি, আমি পাকিস্তানের ঐক্য টিকিয়ে রাখব। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের কাছে এটি আমার ওয়াদা, আমি এই দেশটিকে বাঁচাব। মানুষ আমার কাছে এটিই আশা করে। আমি তা বিফল হতে দেব না। গুটিকয়েক লোকের হাতে কোটি কোটি নিরপরাধ পাকিস্তানির আবাসভূমি আমি ধ্বংস হতে দেব না। পাকিস্তানের একতা, সংহতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য এবং এটি পালন করতে তারা কখনো পিছপা হয়নি।[১৩]

৬ মার্চ ইয়াহিয়ার বেতার-টেলিভিশনে ঘোষণার পর ঢাকায় তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। সেনাবাহিনীর টহল দলগুলো ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গিয়েছিল। শেখ মুজিব পরদিন রেসকোর্সে ভাষণ দেবেন, প্রায় সব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সর্বত্র কানাঘুষা, শেখ মুজিব কি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন? ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের টেলিফোনে কথা হলো। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে অনুরোধ করলেন এমন কিছু না বলতে, যেখান থেকে আর ফেরার উপায় থাকবে না।[১৪]

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভাটি ছিল পূর্বনির্ধারিত। ওই দিন শেখ মুজিব কী বলবেন, তা নিয়ে অনেক জল্পনা ছিল। আগের দিন ও রাতে তাঁর হাইকমান্ডের সদস্যদের সঙ্গে শেখ মুজিব বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন মনে করেছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হবে অসময়োচিত। তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার ঘোষণা জন্য দলের তরুণদের চাপ ছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন :

> আওয়ামী লীগের তরুণেরা, যেমন সিরাজুল আলম খান যিনি কাপালিক নামে পরিচিত, এখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পুরোদস্তুর মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার পক্ষে ছিলেন। ৭ মার্চের সভায় যাওয়ার আগে নুরুল ইসলাম ও আমি তাদের মনের ভাব জানার জন্য ইকবাল হলে গেলাম। কাপালিকের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে হতাশ মনে হলো। তিনি বললেন, স্বাধীনতার কোনো নাটকীয় ঘোষণা আসছে না।[১৫]

৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ঢাকায় ওই সময়ের ভারপ্রাপ্ত সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার বয়ানটি উল্লেখযোগ্য। এটি ছিল ক্রান্তিকাল এবং শেখ মুজিবের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। জেনারেল রাজার বিবরণ থেকে জানা যায় :

> ৬ মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের একজন বার্তাবাহক আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, দলের ভেতরে কট্টরপন্থী ও ছাত্রনেতারা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছেন। শেখ মুজিব একজন দেশপ্রেমিক। তিনি পাকিস্তান ভাঙার দায় নিতে চান না। এ জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন যেন একদল সেনা পাঠিয়ে তাঁকে ধানমন্ডির বাসা থেকে সেনানিবাসে এনে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়।
>
> শেখ মুজিবের বার্তা শুনে ৭ মার্চের ব্যাপারে আমার অবস্থান শক্ত করলাম। আমি বার্তাবাহককে বললাম, মুজিব নিঃসন্দেহে একজন দেশপ্রেমিক এবং একজন ছাত্রনেতা হিসেবে কলকাতায় পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা আমি জানি। যা তৈরি করতে তিনি সাহায্য করেছেন, তা কী করে তিনি ধ্বংস করতে পারেন? তিনি সেনানিবাস এলাকা ভালোই চেনেন এবং নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করলে আমার সম্মানিত অতিথি হিসেবে তাঁকে আমি স্বাগত জানাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসতে পারেন। এ জন্য এসকর্ট পাঠানোর দরকার নেই। রাত দুটোর সময় আমাকে ঘুম থেকে তুলে জানানো হলো, দুজন পূর্ব পাকিস্তানি ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছেন। তাঁরা শেখ মুজিবের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিলেন। তাঁদের নাম আমার মনে নেই। তাঁদের একজন জননেতা, যাঁর কথা আগেই শুনেছিলাম। তিনি আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে শেখ মুজিবকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে আসার ওপর জোর দিলেন। আমি বললাম, তিনি যেন শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেন যে রেসকোর্সে তিনি যে ভাষণ দেবেন, আমি

সেনানিবাসে বসে তা শুনব। সে ব্যবস্থা করা আছে। তিনি যদি দেশের সংহতি নষ্ট করে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, আমি বিনা দ্বিধায় আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে দায়িত্ব পালন করব। সেনাবাহিনীকে বলা হবে মিটিং ভেঙে দিতে এবং প্রয়োজনবোধে ঢাকা শহর গুঁড়িয়ে দিতে। শেখকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, বিচক্ষণতার পরিচয় না দিলে এর ফল হবে মারাত্মক এবং এর দায় তাঁর ঘাড়েই পড়বে। তাঁর উচিত হবে আলোচনার দরজা খোলা রাখা এবং অনাবশ্যক রক্তপাত এড়ানো।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কথা শুনে তিনি চরমপন্থার দিকে যাননি এবং আলোচনার দরজা খোলা রাখলেন। সেনাবাহিনী নিয়ে আমি তৈরি ছিলাম। তাঁর ভাষণ আমি সরাসরি শুনেছি। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল আপসমূলক এবং ৪ মার্চে দেওয়া তাঁর দাবিগুলো তিনি আবারও উল্লেখ করলেন। কয়েক মিনিটেই শেষ হলো তাঁর বক্তৃতা। তিনি তাড়াহুড়ো করে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। এটা ছিল অনেকটা অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানালাম এবং স্বস্তি পেলাম।[১৬]

৭ মার্চ রেসকোর্সের স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় শেখ মুজিব এসেছিলেন বেলা তিনটায়। তিনিই ছিলেন একমাত্র বক্তা। তাঁর ১৯ মিনিটের ভাষণটি ছিল নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে ষড়যন্ত্র এবং নিরস্ত্র জনতার ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য চারটি শর্ত দিলেন। শর্তগুলো হচ্ছে :

সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;
সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে;
নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের তদন্ত করতে হবে;
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এই চার শর্ত পূরণ হলেই তিনি অধিবেশনে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে ঘোষণা দেন। তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, আবার 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার' আহ্বান জানান এবং 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার' জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। তাঁর ভাষণের শেষ লাইনটি ছিল, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এ শব্দগুলো তিনি তাঁর ভাষণে দুবার উচ্চারণ করেছিলেন। জনসভায় তিনি কী বলেছেন, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তিনি কী বলেননি। তিনি সভা শেষ করলেন 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে। কেউ কেউ বলেন, ওই দিন তিনি 'জয় পাকিস্তান'ও বলেছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা নিজ কানে এটি শুনেছেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৭ মার্চের সভামঞ্চ, ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিব যখন রেসকোর্সে ভাষণ দিচ্ছিলেন, লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়ে একটি বিমান তখন করাচি থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে এসে নামে।

অনেকেই আশা করেছিলেন, রেডিওতে মুজিবের ভাষণ সরাসরি প্রচার করা হবে। সিদ্ধান্ত সে রকমই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এ জন্য রেডিওর বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরদিন সকালে রেডিওতে এই ভাষণ পুরোটা প্রচার করা হয়।

তেহরিক-ই-ইস্তিকলাল পার্টির সভাপতি এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান মার্চের প্রথম সপ্তাহেই ঢাকায় এসেছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর তিনবার বৈঠক হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলেন না। শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করবেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে মুজিব বলেন, তিনি একজন পাকিস্তানি এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন; পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়ে 'বান করে রাহেগা পাকিস্তান' (পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়ব) স্লোগান দিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। 'তখন কোথায় ছিলেন ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টো?' আসগর খান জানতে চান, কীভাবে এই অচলাবস্থা ভাঙবে? জবাবে মুজিব বলেন, এটি পরিষ্কার যে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন। তারপর আসবেন মির্জা মুজাফফর আহমদ (পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান), তারপর আসবেন ভুট্টো। এরপর ইয়াহিয়া সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেবেন এবং এভাবেই শেষ হয়ে যাবে পাকিস্তান। মুজিব আশঙ্কা করছেন, তাঁকে বন্দী করা হবে, নতুবা তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিংবা তাঁর নিজের লোকদের হাতে মারা যাবেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, মুজিবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটনাগুলো ঘটেছিল।[১৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য মিত্র। একাত্তরের মার্চে এ দেশে যা ঘটে যাচ্ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ঢাকার রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচ ওয়াশিংটনে বসে মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা টের পাচ্ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন খুব কম লোককেই পছন্দ করতেন। তাঁর পছন্দের তালিকায় ইয়াহিয়া খান ছিলেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় নিক্সনের প্রশংসা ও ভালো লাগা উপচে পড়ত।[১৮]

আওয়ামী লীগকে মধ্যপন্থী ও মার্কিনঘেঁষা মনে করা হতো। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাড আওয়ামী লীগকে মধ্য-বাম, সংযত ও মধ্যবিত্তের দল হিসেবে বিবেচনা করতেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যার কোনো বৈরী মনোভাব নেই। শেখ মুজিব যুক্তরাষ্ট্রকে পছন্দ করেন এবং সানফ্রানসিসকোর ব্যাপারে তাঁর ভালো লাগার কথা গোপন করতেন না।[১৯]

পক্ষান্তরে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন প্রচণ্ড রকম মার্কিনবিরোধী। নিক্সন তাঁকে অপছন্দ করতেন। তাঁর মতে, 'বেজন্মাটা একটা গলাবাজির রাজনীতিবিদ।' নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের ধারণা ছিল, ভুট্টো ভারতবিরোধী ও চীনপন্থী। আর্চার ব্লাড ভুট্টো সম্পর্কে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—পরশ্রীকাতর।[২০]

কিসিঞ্জার ১০ মার্চ নিক্সনকে বলেন, ইয়াহিয়া এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে। তবে সামরিক অভিযান সফল না-ও হতে পারে। শেখ মুজিব গান্ধীর মতো অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলন দমন করার জন্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। একটি দীর্ঘমেয়াদি বিদ্রোহ শুরু হলে তা দমন করার সামর্থ্য পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর নেই। প্রেসিডেন্টকে তিনি চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন :

> সবচেয়ে ভালো হবে নিষ্ক্রিয় থাকা এবং কিছুই না করা, যাতে ইয়াহিয়া আপত্তিকর কিছু মনে না করে। গৃহযুদ্ধ এড়ানোর বল এখন ইয়াহিয়ার কোর্টে। এ সময় কিছু বলা উচিত হবে না। কেননা পরিস্থিতির ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা কিছু বললে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাকে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ মনে করতে পারে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। পাকিস্তান এক আছে, এটি মনে করাই হবে সুবিধাজনক। আমাদের কোনো পদক্ষেপ যেন বিচ্ছিন্নতাকে উসকে না দেয়।[২১]

১২ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি থেকে একজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা ঢাকায় এসে তাজউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে চান। কামাল হোসেন বিষয়টি শেখ মুজিবকে জানালে তিনি কামাল হোসেনকে ওই কর্মকর্তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে বলেন। কর্মকর্তাটি বলেন, ইয়াহিয়া যদি ঢাকায় আসেন তাহলে মুজিব তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হাউসে দেখা করবেন কি না। এ প্রশ্ন তিনি করছেন, কারণ এর আগে মুজিব গভর্নর হাউসে গিয়ে টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, টিক্কা খানকে তাঁর বাসায় এসে দেখা করতে হবে। এটি পরিষ্কার হওয়া দরকার। মুজিব ইয়াহিয়াকে তাঁর বাসায় আসতে বলবেন কি না। কামাল হোসেন বিষয়টি শেখ মুজিবকে জানালে মুজিব বলেন, তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর পছন্দমতো জায়গায় দেখা করবেন, সেটি প্রেসিডেন্ট হাউসও হতে পারে। তবে তিনি যদি তাঁর বাসায় আসেন তাঁকে স্বাগত জানানো হবে।[২২]

ইতিমধ্যে ভুট্টো সংবিধান প্রশ্নে একটি ফর্মুলা ঠিক করে ফেলেছেন। ১৪ মার্চ সিন্ধু প্রদেশের লারকানায় এক জনসভায় তিনি বলেন, সংবিধান তৈরির আগেই যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কাছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কাছে তা করতে হবে; তারপর 'সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুটি দলকে' ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি করতে হবে।[২৩]

ভুট্টোর কথার অর্থ দাঁড়ায়, পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ আবার 'এক

ইউনিট’ হয়ে যাবে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাস ঠিক হওয়ার আগেই দেশে দুটি ‘সার্বভৌম অঞ্চল’ তৈরি হবে। ১৫ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ভুট্টো বলেন, গণমাধ্যম ও স্বার্থান্বেষী মহল প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে; তিনি কী বলতে চেয়েছেন তা সাধারণ মানুষ ঠিকই বুঝতে পেরেছে।[২৪]

১৫ মার্চ করাচির নিশতার পার্কে এক জনসভায় ভুট্টো দাবি করেন, জাতীয় পরিষদের ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। তিনি বলেন, সংবিধান তৈরির আগে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার যে দাবি শেখ মুজিব করেছেন, তা হতে হবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে। তিনি বলেন, দেশের দুটি অংশ—পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে, যদি আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবি থেকে সরে আসে। ছয় দফার ব্যাপারে পাকিস্তানের দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি দলের মধ্যে ঐকমত্য হওয়া দরকার। তিনি বলেন :

> আমি পরিষদের বাইরে একটি সমঝোতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আওয়ামী লীগ যদি সাড়া না দেয়, তাহলে আমরা অসহায়।...প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছে।...আওয়ামী লীগ যদি ‘বাংলাদেশ’ নিয়ে কথা বলে, তাহলে আমিও তো ‘সিন্ধুদেশ’ ও ‘পাঞ্জাবদেশ’ নিয়ে কথা বলতে পারি। তাহলে উপমহাদেশের ৩০ লাখ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত কায়েদে আজমের পাকিস্তানের কী হবে? আওয়ামী লীগই সংবিধান তৈরির বিষয়টি রাজপথে নিয়ে গেছে।...ছয় দফার ব্যাপারে তার দলের কোনো অনড় অবস্থান নেই। তার দল প্রতিটি দফার ব্যাপারে মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে চায়। একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যসংক্রান্ত বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে গেছে।[২৫]

প্রশাসন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সে জন্য ১৫ মার্চ শেখ মুজিব ৩৫টি বিধি জারি করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের প্রশাসন নিজ হাতে নিয়ে নিলেন।

ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন ১৫ মার্চ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, জেনারেল পীরজাদা, আইএসআইয়ের প্রধান মেজর জেনারেল আকবর, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক এন এ রিজভী এবং পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান এম এম আহমদ। ১৬ মার্চ বেলা ১১টায় শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন। তাঁর গাড়িতে কালো পতাকা ছিল। মুজিব ইয়াহিয়ার কাছে তাঁর চারটি

শর্তের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। সংবিধান তৈরির আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে ইয়াহিয়া মন্তব্য করেন। শেখ মুজিব বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলবেন। পরদিন ১৭ মার্চ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সঙ্গে আবার দেখা করেন।[২৬]

সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থীদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল আবুবকর ওসমান মিঠা (কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল), খুদাদাদ খান (অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল), ইফতেখার জানজুয়া (মাস্টার জেনারেল অর্ডন্যান্স) ও গোলাম উমর (জাতীয় নিরাপত্তা সেলের প্রধান)। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়। সামরিক জান্তার ধারণা ছিল, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, যাঁরা আগে থেকেই ঢাকায় ছিলেন, তাঁরা অতটা কঠোর হতে পারবেন না। ১৬ মার্চ টিক্কা খান খাদিম হোসেন রাজা ও ফরমান আলীকে সামরিক অভিযানের একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে বলেন। ১৯ মার্চ তাঁরা দুজন অভিযানের একটি ছক তৈরি করে জেনারেল টিক্কা ও জেনারেল হামিদকে দেন। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের এ পরিকল্পনা গোপন রাখা হয়।[২৭]

এদিকে মুজিব-ইয়াহিয়া সংলাপ চলতে থাকে। ১৯ মার্চ ঢাকায় অবস্থিত ৫৭ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব জয়দেবপুরে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে যান। ফেরার পথে জয়দেবপুর রেলক্রসিংয়ে তাঁর গাড়িবহর অবরোধের মধ্যে পড়ে। জনতা ইতিমধ্যে ক্রসিংয়ে মালগাড়ির কয়েকটি ওয়াগন আড়াআড়ি রেখে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। জাহানজেব ২০ মিনিটের মধ্যে ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ দেন। বাঙালি সেনারা জনতার ওপর গুলি করতে চায়নি। তারা মাটিতে ও শূন্যে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। মোট ৬৩টি গুলি ছোড়ার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত হন। পাঁচজন বাঙালি সেনা অস্ত্রসহ পালিয়ে যান।[২৮] এটিই ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি সেনাদের প্রথম নীরব বিদ্রোহ।

১৯ ও ২০ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আবার বৈঠক হয়। তাঁদের দুজনের সঙ্গেই ছিল নিজ নিজ পরামর্শক টিম। তাঁরা জানালেন, কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট একটি ফরমান জারি করবেন। ঐকমত্যের বিষয়গুলো ছিল :

ক) সামরিক আইন তুলে নেওয়া;
খ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর;
গ) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছয় দফার ভিত্তিতে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন।[২৯]

শেখ মুজিব ২১ মার্চ ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দেন, আপাতত প্রদেশগুলোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। শেখ মুজিবের দেওয়া প্রস্তাবগুলো ছিল :

ক) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার;
খ) পাঁচটি প্রদেশে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর;
গ) কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়ার বহাল থাকা;
ঘ) জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের আলাদা সভা করে নিজ নিজ প্রদেশের জন্য সংবিধান তৈরি;
ঙ) ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন করে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর জন্য ১৯৬২ সালের সংবিধানে দেওয়া ক্ষমতা অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিজেদের স্বায়ত্তশাসনের পরিধি ঠিক করা;
চ) এই প্রস্তাবগুলো প্রেসিডেন্টের একটি আদেশ হিসেবে জারি করা।[৩০]

২১ মার্চ সন্ধ্যায় ভুট্টো ঢাকায় আসেন। ইয়াহিয়া ২২ মার্চ শেখ মুজিব ও ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের এক ফাঁকে মুজিব ভুট্টোকে নিয়ে পাশের কামরায় যান এবং সেখানে বসা অন্যদের সরে যেতে বলেন। সেখানে মুজিব ভুট্টোর হাত ধরে অনুরোধ করেন, তিনি যেন সামরিক বাহিনীকে বিশ্বাস না করেন। তিনি বলেন, 'তাঁরা প্রথমে আমাকে শেষ করবে, তারপর আপনাকে।' ঘরে গোপন টেপ রেকর্ডার থাকতে পারে এই আশঙ্কায় ভুট্টো মুজিবকে টেনে পাশের বারান্দায় নিয়ে যান। যাহোক, ভুট্টো মুজিবের কথায় সায় দেননি। ২২ মার্চ ঢাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়, ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে একটি আপসরফা হয়েছে।[৩১]

এরপর কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে। ২৩ মার্চ রাতে যুব নেতারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে যান। রাত তখন ১০টা হবে। বঙ্গবন্ধু স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে খাটে শুয়ে আছেন। যুব নেতারা মেঝের ওপর বসলেন। বঙ্গবন্ধু এক হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে কাত হয়ে আধশোয়া অবস্থায় কথা বলতে লাগলেন। যুব নেতারা বললেন, 'স্বাধীনতা ঘোষণা করে দ্যান।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'অনেক ভেবেছি, কোথাও সাপোর্ট নাই। ইন্ডিয়া সাপোর্ট দিতে পারে, না-ও পারে। রাশিয়া দেবে কি না জানি না। আমেরিকা সাপোর্ট দেবে না। চায়না—হুজুরকে (মওলানা ভাসানী) বলেছি, নিগেটিভ।' ঠিক এ সময় সিরাজুল আলম খান উঠে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট পর। বঙ্গবন্ধু মুচকি হেসে সিরাজুল আলম খানকে বললেন, 'অ, তুই বুঝি মোস্তাকের (খন্দকার মোশতাক আহমদ) কাছে গেছিলি?'[৩২] সিরাজুল আলম খান বললেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য আলাদা মুদ্রার প্রস্তাব দেন।'[৩৩]

চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের একটি অংশের চাপ ছিল। ছাত্রদের দাবি ছিল গণ-আন্দোলন নিয়ে কোনো আপস চলবে না। কেন্দ্রে ক্ষমতা নেওয়াটা আপস হিসেবে দেখার একটা সুযোগ ছিল। কয়েকজন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়টি জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন।[৩৪]

২৩ মার্চ দুপুর পৌনে ১২টায় কামাল হোসেন শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের কাছে একটি খসড়া সংবিধানের প্রস্তাব হস্তান্তর করেছিলেন। ২৬ পৃষ্ঠার টাইপ করা এই প্রস্তাবে একটি ভূমিকা, ১৮টি ধারা এবং অনেক উপধারা ছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটি সাংবিধানিক কনভেনশন আয়োজন করা হবে এবং তারা দুই অংশের জন্য দুটি আলাদা সংবিধান রচনা করবে। এটিও জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রেসিডেন্ট যেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এটি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন।[৩৫]

২২ মার্চের পর ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আর কোনো বৈঠক হয়নি। ২৪ মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় আওয়ামী লীগের আলোচক দল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আবার বৈঠক করে। ওই বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা হলো, দেশের নাম হবে 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান'। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াস 'কনফেডারেশন' শব্দটিতে আপত্তি জানিয়ে 'ইউনিয়ন' রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের আলোচক দল এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। খসড়া প্রস্তাবটি কখন চূড়ান্ত করা হবে, আলোচক দলের অন্যতম কামাল হোসেন এটি জানতে চাইলে পীরজাদা বলেন, পরদিন তিনি টেলিফোনে বলবেন। একটি ফোনের জন্য কামাল হোসেন সারা দিন অপেক্ষা করে ছিলেন। ফোনটি আর আসেনি।[৩৬]

আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, যে তারিখে প্রাদেশিক গভর্নর শপথ নেবেন, সেই তারিখ থেকেই প্রদেশ থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে এবং এই মর্মে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে সমগ্র পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন উঠে যাবে। অন্তর্বর্তী সময়ে ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রশাসন চলবে। এ সময় জাতীয় পরিষদ কিংবা কোনো রাজ্য পরিষদ (স্টেট অ্যাসেম্বলি) স্থগিত অথবা বাতিল করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে না। প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্য সরকার (স্টেট গভর্নমেন্ট) ও রাজ্য পরিষদ তাদের কাজ চালাবে। বাংলাদেশ বা তার যেকোনো অংশের জন্য আইন তৈরির ক্ষমতা বাংলাদেশ রাজ্য পরিষদের হাতে থাকবে। বাংলাদেশ হবে 'স্টেট অব বাংলাদেশ'। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান (স্টেট অব ওয়েস্ট

পাকিস্তান) তার জন্য আইন তৈরির ক্ষমতা রাখবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া পররাষ্ট্র বিষয়, আন্তর্জাতিক ও আন্তআঞ্চলিক যোগাযোগ, সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রের যাবতীয় সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয় জাতীয় পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে।[৩৭]

আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত ঘোষণায় ১৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, ঢাকার স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের নতুন নাম হবে রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ। ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকার পরিষদ ভবনে বিকেল চারটায় অধিবেশনে বসবেন এবং ৪৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান তৈরি করবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যরা একই দিনে ইসলামাবাদে স্টেট ব্যাংক ভবনে মিলিত হবেন এবং ৪৫ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সংবিধান তৈরি করবেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিজ নিজ সংবিধান তৈরির পর প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন এবং সব সদস্য মিলে সার্বভৌম কনফেডারেশন অব পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান তৈরি করবেন। প্রেসিডেন্ট সাত দিনের মধ্যে এই সংবিধান অনুমোদন করবেন অথবা সাত দিন পার হয়ে যাওয়ার পর তা অনুমোদিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়, এ ঘোষণা কার্যকর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ১১ সদস্যের একটি বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করবেন। এই পরিষদে বাংলাদেশ থেকে ছয়জন, পাঞ্জাবের দুজন এবং সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। এ ছাড়া দেশরক্ষাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সব চাকরিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকিস্তানের সব অঞ্চল থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।[৩৮]

আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে ভুট্টো পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দেন একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রচণ্ড সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের, যা শেখ মুজিব ও তাঁর অনুগামীদের সংবিৎ ফিরিয়ে আনবে।[৩৯]

জনমনে একটি ধারণা ছিল, আলোচনা এগোচ্ছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব ও ভুট্টো সবাই জানতেন, পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে। নানান ঘটনাপ্রবাহে মনে হয়, একটি অনিবার্য পরিণতি ধেয়ে আসছে, কিন্তু মুখে এটি কেউ বলছেন না। সাধারণ মানুষকে অন্ধকারেই রেখে দেওয়া হয়েছিল।
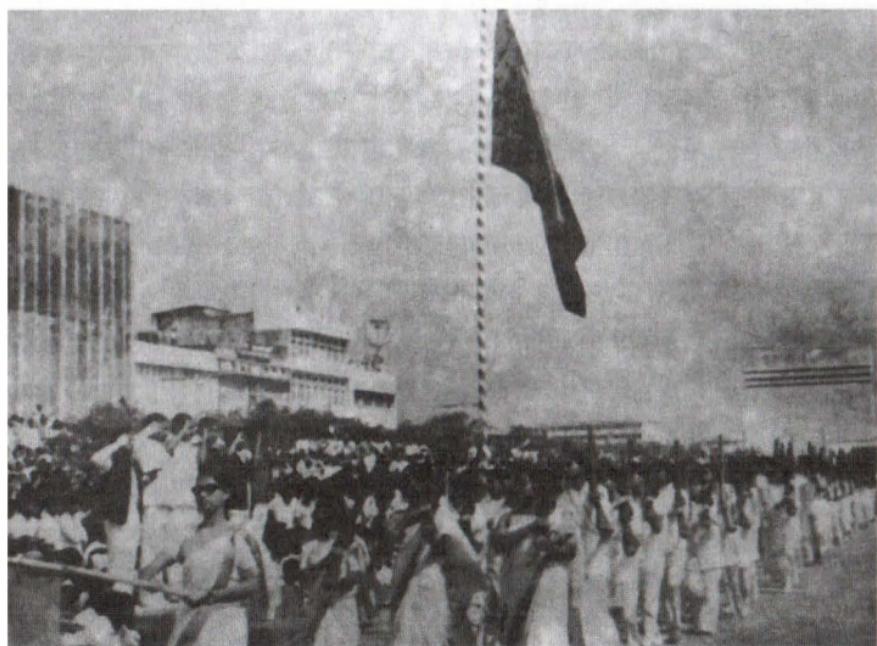
বেলুচিস্তান ন্যাপের সভাপতি ও পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মীর গাউস বখশ বিজেঞ্জো নির্বাচনের আগে নির্বাচন নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তান প্রসঙ্গ উঠতেই ইয়াহিয়া বলেছিলেন :

সুনার অর লেটার, ইস্ট পাকিস্তান উইল হ্যাভ টু বি অ্যাম্পুটেড, অ্যান্ড ইফ অ্যাট অল দ্যাট ইজ টু হেপেন, হোয়াই লেট দেম সাক আওয়ার ব্লাড ফর টু অর থ্রি মোর ইয়ারস (আগে কিংবা পরে পূর্ব পাকিস্তানকে কেটে বাদ দিতেই হবে এবং এটিই যদি ঘটে, তবে ওদের কেন আরও দু-তিন বছর আমাদের রক্ত চোষার সুযোগ দেব)?[৪০]

একাত্তরের মার্চে সংকট যখন বাড়ছে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় ষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পিপলস পার্টি ছাড়া অন্যান্য দলের অনেকেই ায় এসেছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকিস্তান ন্যাপের পতি খান আবদুল ওয়ালি খান ও মীর গাউস বখশ বিজেঞ্জো ১৩ মার্চ ঢাকায় সন। ১৪ মার্চ তাঁরা শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ধানমন্ডির বাসায় দেখা করেন। জেঞ্জোর বর্ণনা থেকে জানা যায় :

আমরা আশা করছি, আপনি খোলা মনে আপনার পরিকল্পনা আমাদের জানাবেন, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে যারা আপনার রাজনৈতিক ভূমিকা সমর্থন করে, আমরা তাদের অন্যতম। আপনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এবং আপনার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত। আপনি যদি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তাহলে বুঝতেই পারছেন আমরা কী দারুণ সমস্যায় পড়ব।

এ কথা শুনে শেখ সাহেব খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁর চোখে পানি। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে কাকে বলছে পাকিস্তান না ভাঙতে? আপনারা যারা

মার্চ ঢাকায় ছাত্রলীগের র‍্যালি। সামনে পতাকা হাতে ঝিলু শামসুন্নাহার ইকো

কংগ্রেসে ছিলেন (স্বাধীনতার আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত দিয়ে) আমাকে বলছেন, যে কিনা গোঁড়া মুসলিম লীগার এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলাম? কী নির্মম পরিহাস!'

ওয়ালি খান স্বভাবসুলভ রসিকতা করে শেখকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা তখন আপনাকে ভারত ভেঙে পাকিস্তান না বানানোর অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আপনি পাকিস্তান বানালেন। এখন আমরা হাতজোড় করে ভিক্ষা চাইছি, পাকিস্তান ভাঙবেন না। কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনি পাকিস্তান ভাঙবেন। আপনারা—অতীতের ও বর্তমানের সব মুসলিম লীগার—আসলেই একটি বিশেষ প্রজাতি।...

শেখ মুজিব বললেন, 'আমি আপনাদের বলতে চাই, তারা (ইয়াহিয়া গং) আমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, যদি এতে পাকিস্তান ভেঙেও যায়। পাঞ্জাব আমাদের ক্ষমতায় আসতে দেবে না।'[৪১]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করে বিজেঞ্জো পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য শেখ মুজিবের প্রস্তাব অনুযায়ী দুই সংবিধানের প্রসঙ্গ তুলতে গেলে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, 'আপনার বন্ধু মুজিব যদি পথে না আসে, আমার সেনাবাহিনী জানে কীভাবে পথ বের করে নিতে হয়।' ওয়ালি খান ও বিজেঞ্জো ২৪ মার্চ শেষবারের মতো দেখা করতে গেলে শেখ মুজিব তাঁদের বলেছিলেন, 'ভালো হয় যদি আপনারা দুজন ঢাকা ছেড়ে চলে যান। সেনাবাহিনী দুদিনের মধ্যেই আমাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'[৪২]

ছাত্রলীগ ২৩ মার্চকে পতাকা দিবস ঘোষণা করে এবং সবাইকে ওই দিন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানায়। ছাত্রলীগের একটি র‍্যালি সকালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শেষ পর্যন্ত ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে যায় এবং ওই বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। ওই দিন ব্রিটিশ ও সোভিয়েত দূতাবাসেও বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। ইরান, ইন্দোনেশিয়া ও নেপাল দূতাবাসে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা হয়। চীনা দূতাবাসে পাকিস্তানি পতাকা তোলার সময় একদল ছাত্র জোর করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ছিল। মার্কিন কনসাল জেনারেলের বাসায় একদল ছাত্র বাংলাদেশের পতাকা তুলতে গেলে আপত্তির মুখে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।[৪৩]

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের 'প্রজাতন্ত্র দিবস'। ২৩ মার্চ অনুষ্ঠান শেষে যাতে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো ও জাতীয় পতাকা দেখাতে না হয়, সে জন্য ঢাকা টেলিভিশনের বাঙালি কর্মীরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের কর্মসূচি প্রলম্বিত করে রাত ১২টার পরে নিয়ে যান।

THE PAKISTAN OBSERVER

Interim arrangement may be announced Mar. 25

# Martial Law likely to go

Resistance Day

No question of compromise on our principle

Coup in Argentina

Frontier and Baluch leaders suspicious

Leaders call on Mujib

সমঝোতার পূর্বাভাস পাওয়া যায় ২৫ মার্চের পত্রিকায়

ইয়াহিয়া ২৪ মার্চ টিক্কা খান ও ফরমান আলীকে ডেকে অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়ার বক্তব্য ছিল, 'দেশকে অখণ্ড রাখার জন্য কয়েক হাজার মানুষ মারতে হলেও এটি খুব বড় একটি মূল্য নয়।'[৪৪]

২৫ মার্চ শেখ মুজিব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কিছু এলাকায় জনতার ওপর সেনাবাহিনীর হামলার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ হরতাল ডাকেন।[৪৫] এটিই ছিল ২৫ মার্চ কালরাতের আগে শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের শেষ কর্মসূচি।

পাকিস্তানি সেনারা যে আক্রমণ চালাবে, শেখ মুজিব তা বুঝতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বিবরণ থেকে এটি স্পষ্ট। বামপন্থী লেখক তারিক আলীর বাবা মাজহার আলী খান রেহমান সোবহান সম্পাদিত সাপ্তাহিক *ফোরাম*-এ কলাম লিখতেন। মাজহার একসময় *পাকিস্তান টাইমস*-এর সম্পাদক ছিলেন এবং ওই সময় থেকেই শেখ মুজিব তাঁকে চিনতেন। ২৫ মার্চ শেষ বিকেলে মাজহার আলী খানকে নিয়ে রেহমান সোবহান শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। এই সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন রেহমান সোবহান :

> বঙ্গবন্ধু আমাদের জানালেন যে সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তারা কঠোর ব্যবস্থা নেবে।...'ইয়াহিয়া মনে করেছে যে আমাকে হত্যা করলেই সে আন্দোলন ধ্বংস করে দিতে পারবে। কিন্তু সে ভুল করছে। আমার কবরের ওপর স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হবে।' বঙ্গবন্ধুর আচরণে তাঁকে বরং অদৃষ্টবাদী মনে হচ্ছিল, কারণ তিনি যেন তাঁর সম্ভাব্য অকালমৃত্যুকে মেনেই নিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বললেন যে নতুন প্রজন্ম এই স্বাধীনতাসংগ্রামকে এগিয়ে নেবে।...[৪৬]

ভুট্টোর সঙ্গে শেখ মুজিবের দূতিয়ালির কাজটি করছিলেন পিপিপির নেতা গোলাম মোস্তফা খার। ২৪ মার্চ রাতে মোস্তফা খার শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে মুজিবকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো। তিনি মোস্তফা খারকে বললেন, চট্টগ্রামে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভুট্টোর উচিত হবে তাঁর প্রস্তাব মেনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানকে তাঁর (মুজিবের) হাতে ছেড়ে দেওয়া। মোস্তফা খার বললেন, তিনি এই বার্তা ভুট্টোকে পৌঁছে দেবেন। তবে ভুট্টো পাকিস্তান ভাগ করতে চাইবেন কি না তা নিয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। সিদ্ধান্ত হলো, মোস্তফা খার ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবের বাসায় আবার আসবেন। ২৫ মার্চ রাত আটটায় মোস্তফা খারকে ধানমন্ডিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেখ মুজিব একজনকে পাঠিয়েছিলেন। মোস্তফা খার তাঁকে বলেন যে যেহেতু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাই সভাটি স্থগিত করা হোক। করাচি ফিরে যাওয়ার আগে তাঁরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আবার দেখা করতে পারেন এবং নতুন কিছুর সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁরা ঢাকায় থেকে যাবেন। শেখ মুজিবের দূত মোস্তফা খারকে বলেন যে প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন।[৪৭]

রাতে সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। শেখ মুজিব বন্দী হন। যে কমান্ডো দলটি শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, তার দায়িত্বে ছিলেন লে. কর্নেল (পরবর্তী সময়ে ব্রিগেডিয়ার) জেড এ খান। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারের কর্নেল আহমদের কাছ থেকে তিনি শেখ মুজিবকে পরদিন অথবা তার পরদিন গ্রেপ্তার করার নির্দেশ পান। ২৪ মার্চ বেলা ১১টায়

দৈনিক
ইত্তেফাক
এ গণহত্যা বন্ধ কর
২৭শে মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে সর্বাত্মক হরতাল

২৫ মার্চ ১৯৭১ *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পৃষ্ঠা। আওয়ামী লীগ ২৭ মার্চ হরতাল ডেকেছিল

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গ্রেপ্তারের আনুষ্ঠানিক নির্দেশ দেন। ২৫ মার্চ সকালে জেনারেল আবদুল হামিদ কর্নেল জেড এ খানকে স্মরণ করিয়ে দেন, শেখ মুজিবকে অবশ্যই জীবিত ধরতে হবে। কর্নেল খান তিনটি গ্রুপে তাঁর সেনাদের ভাগ করে তাদের মেজর বিলাল, ক্যাপ্টেন হুমায়ুন ও ক্যাপ্টেন সাঈদের অধীনে ন্যস্ত করেন। ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টার দিকে ক্যাপ্টেন সাঈদ শেখ মুজিবের বাড়ির আশপাশ রেকি করেন। রাত ১১টায় দলটি এয়ারফিল্ড থেকে রওনা হয়। পথে কয়েকটি ব্যারিকেড সরিয়ে তারা ধানমন্ডির বাড়িতে পৌঁছায়। অপারেশনটি কর্নেল খান বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> নিচতলা সার্চ করা হয় কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না।
>
> অনুসন্ধানী দল ওপরতলায় যায়। যেসব কামরা খোলা ওখানে কাউকে পাওয়া গেল না। একটি কামরা ভেতর থেকে আটকানো। আমি ওপরতলায় গেলে একজন আমাকে বলে, বন্ধ কামরাটার ভেতর থেকে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আমি মেজর বিলালকে বন্ধ কামরাটার দরজা ভেঙে ফেলতে বলে ক্যাপ্টেন সাঈদ এসেছে কি না দেখার জন্য নিচতলায় নেমে আসি।...
>
> আমি ক্যাপ্টেন সাঈদকে গাড়িগুলো কীভাবে লাইন করতে হবে, সে ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছিলাম, তখন প্রথমে একটি গুলির শব্দ, তারপর গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং শেষে সাবমেশিনগান থেকে ব্রাশফায়ারের আওয়াজ শুনতে পাই। ভাবলাম, কেউ বুঝি শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছে। আমি ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে ওপরতলায় গিয়ে যে ঘরটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, সেটির দরজার সামনে কম্পিত অবস্থায় শেখ মুজিবকে দেখতে পাই। আমি তাঁকে আমার সঙ্গে যেতে বলি।
>
> তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারবেন কি না। আমি অনুমতি দিই। তিনি কামরাটার ভেতরে গেলেন। সেখানে পরিবারের সবাই আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে আসেন। আমরা গাড়িগুলো যেখানে, সেদিকে হাঁটতে থাকি। ক্যাপ্টেন সাঈদ তখনো তাঁর গাড়িগুলো ঘোরাতে সক্ষম হননি। আমি ইস্টার্ন কমান্ডে একটি রেডিওবার্তা পাঠাই যে শেখ মুজিবকে ধরা গেছে।
>
> মুজিব এ সময় আমাকে বললেন, তিনি ভুলে পাইপ ফেলে এসেছেন। আমি আবার তাঁর সঙ্গে ফিরে আসি। পাইপ নিয়ে নেন তিনি। এর মধ্যে শেখ মুজিব নিশ্চিত হয়ে গেছেন, আমরা তাঁকে হত্যা করব না। তিনি বললেন, আমরা তাঁকে ডাকলেই হতো, তিনি নিজে থেকেই বেরিয়ে আসতেন। আমরা তাঁকে বলি, আমরা তাঁকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমরা ফিরে আসতে আসতে ক্যাপ্টেন সাঈদ তাঁর গাড়িগুলো লাইন করে ফেলেন। শেখ মুজিবকে সেনাবাহিনীর গাড়িতে ওঠানো হয়। আমরা ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাত্রা করি।

> আমি পরে জানতে পারি, মেজর বিলালকে ওপরতলায় বন্ধ রুমের দরজাটা ভাঙার জন্য বলে আমি গাড়ির অবস্থা দেখার জন্য যখন নিচে নেমে আসি, ওর সেনারা যেখানে জড়ো হয়েছিল, কেউ একজন সেদিক লক্ষ্য করে একটি পিস্তল দিয়ে গুলি করে। ভাগ্যক্রমে কেউ আঘাত পায়নি। কেউ থামানোর আগেই ওর এক সেনা বারান্দার যেদিক থেকে পিস্তলের গুলি এসেছিল, সেদিকে একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। তারপর সাবমেশিনগানের শব্দে শেখ মুজিব বন্ধ কামরার ভেতর থেকে ডাক দিয়ে বলেন যে তাঁকে হত্যা করা হবে না—এই নিশ্চয়তা দেওয়া হলে তিনি বেরিয়ে আসবেন। তাঁকে নিশ্চিত করা হয়। তখন তিনি বেরিয়ে আসেন।[৪৮]

শেখ মুজিব যখন গ্রেপ্তার হন, তার আগেই ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিল। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্ব, যার সূচনা হয়েছিল ইপিআর হেডকোয়ার্টারে ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে। কিন্তু এই প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টেকেনি। মার্চ মাসজুড়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল উত্তপ্ত। তরুণেরা একটি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য টগবগ করে ফুটছিলেন এবং রাজপথে ডামি রাইফেল নিয়ে মিছিল করছিলেন। ২৫ মার্চ মাঝরাতে তাঁরা সবাই যে যেদিকে পারলেন গা-ঢাকা দিলেন। অনেকের গন্তব্য হলো ভারত সীমান্তের দিকে।

রাত নয়টার পর থেকেই সামরিক হামলার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে আসছিল। তবে এটা যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা নেতারা আঁচ করতে পারেননি। যাঁরা এত দিন 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো' বলে স্লোগান দিয়ে আসছিলেন, তাঁরা জাতিকে তো দূরের কথা, নিজেদেরও সম্ভাব্য হামলা মোকাবিলার জন্য সামান্যতম প্রস্তুত করতে পারেননি। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাসগুলো থেকে সব ছাত্রকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতেও সতর্ক করে দেননি। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হল আক্রান্ত হয়। এতে বেশ কিছু শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক চিশতি হেলালুর রহমান ইকবাল হলে তাঁর কক্ষে ঘুমাচ্ছিলেন। কতটা অসতর্ক থাকলে এ পর্যায়ের একজন ছাত্রনেতা ওই রাতে হলে ঘুমাতে পারেন! অনেকের মতো তিনিও নিহত হন।

শেখ মুজিব তাঁর সহযোগী আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা ও ছাত্রনেতাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলেছিলেন। তিনি নিজে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এমন ধারণাও দেন। শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া গ্রামে স্থানীয় আওয়ামী

লীগ নেতা মো. বোরহানউদ্দিন আহমদ গগন এবং দোলেশ্বর গ্রামে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হামিদুর রহমানের বাড়িতে শেখ মুজিবের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ওখান থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার জন্য একটি লঞ্চও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।[৪৯]

সন্ধ্যা পর্যন্ত ছাত্র-যুবনেতারা জানতেন, শেখ মুজিব তাঁর বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করবেন। লুকিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য তাঁর বাড়ির পেছনের দেয়ালে একটি মই রাখা হয়েছিল।[৫০] তবে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বাড়িতেই থাকবেন।

১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় মার্কিন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট শেখ মুজিবের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, যা নিউইয়র্কের ডব্লিউ নিউজ টিভির ডেভিড ফ্রস্ট শোতে ১৮ জানুয়ারি প্রচার করা হয়েছিল। তিনি কেন গ্রেপ্তার বরণ করলেন, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'আমি বাড়ির বাইরে এলেই পাকিস্তানি কমান্ডোরা আমাকে খুন করে আমার লোকদের নাম করে বলত, বাংলাদেশের চরমপন্থীরা তাঁকে মেরেছে। ইয়াহিয়া যেমন বলত, আমরা তার সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে চরমপন্থীদের হাতে মারা পড়েছে। তারা এটাই চেয়েছিল।' তিনি তো কলকাতা যেতে পারতেন, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'যেতে পারতাম, কিন্তু আমার জনগণকে ফেলে কীভাবে যেতে পারি? আমি তো এই জাতির নেতা। আমি লড়াই করে মরতে পারি। আমি আমার জনগণকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেছিলাম।'[৫১]

এখন প্রশ্ন হলো, ২৫ মার্চ কি অনিবার্য ছিল? এটি কি এড়ানো যেত না? একাত্তরের পুরো মার্চ ধরেই আলোচনা হয়েছে বিস্তর। পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান দুই অনুঘটক শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যকার আলোচনায় দৃশ্যত কোনো মীমাংসা হয়নি। দুজনের কেউ-ই পাকিস্তানের একতা ও সংহতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। পাকিস্তান ভাঙে তো ভাঙুক, এটিই দুজনের জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, ভাঙার দায় একে অন্যের ওপর চাপাতে চেয়েছিলেন। ফলে দায় এসে বর্তায় ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাঁধে। এটি বুঝতে পেরে ইয়াহিয়া দুজনকেই নমনীয় হতে এবং আলোচনা চালাতে অনুরোধ করেছিলেন।[৫২]

২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট একজন মাত্র রাজনীতিবিদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের। তাদের লক্ষ্য ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্রে'র প্রধান পরিকল্পনাকারী ও 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি'র আহ্বায়ক লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে

দেওয়া। হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন অনেকেই, কিন্তু সুনির্দিষ্ট টার্গেট ছিলেন একমাত্র মোয়াজ্জেম। ২৬ মার্চ সূর্য ওঠার আগেই ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় তাঁকে ঘাতকেরা পিস্তল দিয়ে পর পর পাঁচটি গুলি করে এবং তিনি যে মোয়াজ্জেম, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মৃতদেহটি সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তাঁর লাশ আর পাওয়া যায়নি।[৫৩]

২৫ মার্চের সামরিক অভিযান সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েই গেছে। কিছু কিছু বিষয় ছিল ব্যাখ্যার অতীত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এডিসি আরশাদ সামি খান কিছু তথ্য দিয়েছেন। অনেক কিছুই তিনি কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাঁর ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় উপস্থিত সামরিক হাইকমান্ড নিয়ে বৈঠক করে সবুজ সংকেত দিলেন। অপারেশনের জন্য ২৫ মার্চ তারিখটি ঠিক করা হলো। এ ছাড়া সিদ্ধান্ত হলো, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী অন্য সিনিয়র নেতাদের অক্ষত অবস্থায় জীবিত ধরতে

করাচি বিমানবন্দরে রক্ষী পরিবেষ্টিত বন্দী শেখ মুজিব। ডন, করাচি, ১০ এপ্রিল ১৯৭১

হবে। ইয়াহিয়া জোরের সঙ্গে কথাটি কয়েকবার বললেন, তাদের অক্ষত ও জীবিত ধরতে হবে এবং শক্তি যত কম ব্যবহার করে।

আমরা ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে রওনা হলাম। ২৫ তারিখ মধ্যরাতের পরপর আওয়ামী লীগের নেতাদের একটি লম্বা তালিকা ধরে সামরিক অভিযান শুরু হলো। বিস্ময়ের ব্যাপার, শেখ মুজিব ও ড. কামাল হোসেন ছাড়া সবাই হাওয়া হয়ে গেলেন। পরে জানা যায়, তাঁরা ভারতে, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, আসাম ও ত্রিপুরায় পালিয়ে গেছেন। তাঁদের এই চলে যাওয়ার ঘটনায় সামরিক অভিযানের গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মনে হয়, শেখ মুজিব ও কামাল হোসেন ছাড়া সবাইকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে। এই দুজনের থেকে যাওয়া এবং তাঁদের নিয়ে ইয়াহিয়া কী করবেন, এটি কি কোনো পরিকল্পনার অংশ ছিল?

আমরা রাত সাড়ে ১০টায় রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছালাম। জেনারেল হামিদ আমাদের স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়ার সময় গাড়িতে সামনের আসনে আমার সঙ্গে বসে জেনারেল হামিদ সামরিক অভিযান নিয়ে পেছনের আসনে বসা ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। মনে হলো তাঁরা খুব আশাবাদী। একসঙ্গে তাঁরা রাতের খাবার খান এবং শেষরাত অবধি একসঙ্গে ছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা ঢাকায় চিফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান খানের সঙ্গে অপারেশনের খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছিলেন। আমরা যখন জানতে পারলাম শেখ মুজিব ও ড. কামাল হোসেন গ্রেপ্তার হয়েছেন (কামাল হোসেন অবশ্য গ্রেপ্তার হন কয়েক দিন পর), ইয়াহিয়া জানতে চাইলেন, তাঁরা অক্ষত কি না। তারপর নির্দেশ দিলেন বিচারের জন্য তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসতে।
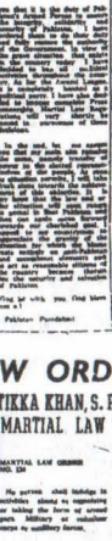
পরদিন সকালে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভুট্টো শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানকে সমর্থন করে সাংবাদিকদের বললেন, 'পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।'[৫৪]

ভুট্টোর রাজনৈতিক সহকর্মী গোলাম মোস্তফা খার ঢাকায় বন্দী শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ছেড়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে ভুট্টো ঢাকা সেনানিবাসে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। ভুট্টোকে দেখে শেখ মুজিব কৌতুক করে বলেন, 'তুমহারা বাপ তো গায়া (তোমার বাপ তো চলে গেছে)।' শেখ মুজিব স্পষ্টতই ইয়াহিয়ার চলে যাওয়া প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছিলেন। ভুট্টো নীরবে অপমানটুক হজম করলেন।[৫৫]

বিনা প্রতিরোধে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করার পর পাকিস্তানের সেনাসদরে বেতারে সংবাদ গেল: বিগ বার্ড ইন দ্য কেইজ (বড় পাখিটা খাঁচায় বন্দী)। রাতের বাকি সময়টুকু শেখ মুজিবকে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট

THE PAKISTAN OBSERVER

# Yahya's Broadcast

FULL TEXT OF THE PRESIDENT OF PAKISTAN'S BROADCAST TO THE NATION ON THE 26TH OF MARCH, 1971

Curfew

MLO 132 on 'Directives' of defunct AL

Mujib arrested

MLO 120 on joining duty

MARTIAL LAW ORDERS

ORDERS BY LIEUTENANT GENERAL TIKKA KHAN, S. Pk psc MARTIAL LAW ADMINISTRATOR ZONE 'B' MARTIAL LAW ZONE 'B' ORDER

২৮ মার্চের পত্রিকায় ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের ভাষণ ছাপা হয়েছিল

স্কুলে রাখা হয়। পরদিন তাঁকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে স্থানান্তর করা হয়। তিন দিন পর তাঁকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। ১০ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের সংবাদটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। ওই দিন করাচির *ডন* পত্রিকায় করাচি বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে রক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় মুজিবের ছবি ছাপা হয়। করাচি থেকে সরাসরি তাঁকে লায়ালপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর জন্য একজন বাঙালি বাবুর্চি জোগাড় করা হয়। তাঁকে তাঁর প্রিয় ব্র্যান্ডের তামাক সরবরাহ করা হয়। সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করার জন্য একজন চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হয়।[৫৬]

৩ এপ্রিল রাতে লালমাটিয়ার কাছে এক বাসা থেকে কামাল হোসেন গ্রেপ্তার হন। তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তাঁকে বিমানে করে করাচি হয়ে রাওয়ালপিন্ডি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলায় হরিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়।[৫৭]

২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া 'সংকটের' জন্য শেখ মুজিবকে

পুরোপুরি দায়ী করেন। তিনি মুজিবকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করেন। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১১ আগস্ট লায়ালপুর জেলের পাশে একটি ভবনে এক সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচার শুরু হয়। একজন ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে অন্য বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সেনাবাহিনীর দুজন ও নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তা এবং পাঞ্জাবের একজন জেলা জজ। তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ ছিল, যার মধ্যে ৬টি ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।[৫৮]

একাত্তরের সংকট ও সংঘাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো—এ তিনজনের ভূমিকার অনেকটাই এখনো অজানা। যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ভাঙল এবং বাংলাদেশ জন্ম নিল, এতে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে নানা আলোচনা আছে। ইয়াহিয়া খান নিজেকে একজন 'অনেস্ট ব্রোকার' মনে করতেন। এ জন্য তিনি পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক সাধারণ নির্বাচনটির আয়োজন করতে পেরেছিলেন। একসময় তাঁর মনে হলো, শেখ মুজিব ও ভুট্টো দুজনই তাঁকে ঠকিয়েছেন এবং নিজেরা সাফসুতরা থেকে তাঁকে বলির পাঁঠা বানিয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর কাছে বীরের মর্যাদা পেয়েছেন এবং তিনি (ইয়াহিয়া) পরিণত হয়েছেন একজন খলনায়কে।

২৫ মার্চ ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট শুরু করার আদেশ দিয়ে ইয়াহিয়া নিশ্চিন্ত মনেই ইসলামাবাদে ফিরে গিয়েছিলেন। ভুট্টো তাঁর পদক্ষেপকে সমর্থন দেওয়ায় তাঁর কাঁধ থেকে যেন একটি বোঝা নেমে গেল। তিনি ভাবলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান' ছিল একটি কঠিন সমস্যা এবং শিগগিরই সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। তিনি ভুট্টোর কাছ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করলেন। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভবনে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ইয়াহিয়া বেশ খোশমেজাজে ছিলেন। তিনি দুটি বড় বেলুন হাতে নিলেন। তারপর একটি করে বেলুনে লাথি মারেন আর বলেন, 'হিয়ার গোওজ মুজিব অ্যান্ড হিয়ার গোওজ ভুট্টো।' তিনি ভাবতেও পারেননি মুজিবের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে কী ভয়াবহ আগুন জ্বলবে এবং ভুট্টো তলে তলে কী কারসাজি করবে।[৫৯]

একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। ভারতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সহকর্মী বরিশালের চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়

ঢাকার ইংরেজি *প্রোব* ম্যাগাজিনকে দেওয়া ডা. আবু হেনার একটি সাক্ষাৎকারে। আবু হেনার বাড়ি সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের একটি আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> একাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে মণি ভাই (শেখ ফজলুল হক মণি) আমাকে বললেন, 'এখন কাজে নামতে হবে, জরুরি একটি কাজে তোমাকে কলকাতা যেতে হবে। সেখানে ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে হবে।' আমি বললাম, মুজিব ভাই না বললে আমি কোথাও যাব না।
>
> ১ বা ২ মার্চ মুজিব ভাই আমাকে ডেকে বললেন, 'আমি ব্যস্ত মানুষ, সব সময় তোমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারব না। এখন থেকে যা বলার মণিই বলবে এবং এটা আমার কথা বলেই জানবে। তুমি ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ভালোই বলো। এ ছাড়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করি এবং সে জন্যই তোমাকে বেছে নিয়েছি।' এবার মণি ভাই আমাকে কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমার প্রতি নির্দেশ ছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বলতে যে যুদ্ধ বাধলে তারা যেন সীমান্ত খোলা রাখে এবং অস্ত্র ও রেডিও ট্রান্সমিটার দিয়ে আমাদের সাহায্য করে।
>
> আমি ৭ মার্চ রওনা হলাম এবং পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে রৌমারী-কুড়িগ্রাম হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছলাম। কিন্তু মণি ভাইয়ের কথামতো সুতারকে পেলাম না। কারণ, তিনি ভুজঙ্গভূষণ নাম নিয়ে কলকাতায় থাকতেন। অবশেষে ভবানীপুরে নর্দান পার্কের কাছে ২১ রাজেন্দ্র রোডের 'সানি ভিলা'য় তাঁর সন্ধান পেলাম। সুতার তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন।
>
> চিত্তরঞ্জন সুতার ১৯৫৪ সালে বরিশাল থেকে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগে তিনি তফসিলি ফেডারেশনের সঙ্গে ছিলেন। পরে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ হলে তিনি ন্যাপে যোগ দেন। কালিদাস বৈদ্যকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬৪ সালে গণমুক্তি পার্টি তৈরি করেছিলেন। পরে এই পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯৬৮ সালে সুতার কলকাতায় চলে যান।
>
> আমি কলকাতায় পৌঁছলাম ১০ বা ১১ মার্চ। ঢাকা ছাড়ার আগেই আমার কোড নম্বর ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল '৯৯'। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন থেকে কলকাতার কর্তৃপক্ষকে এটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় সুতারের বাড়িতে আমি উঠলাম। দিল্লি থেকে দুজন ভদ্রলোক এলেন। তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ এবং বাংলায় কথা বলতে পারেন। তাঁদের নাম আমার মনে নেই। আমরা যখন কথা বলছিলাম, সুতারকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়নি। সে জানেও না আমরা কী কথা বলেছি।

আমি তাদের যা বলার তা বললাম। তারা বলল, অস্ত্র দিয়ে তোমরা কী করবে? তোমাদের লোকদের পাঠিয়ে দাও, আমরা ওদের প্রশিক্ষণ দেব। অস্ত্রের ব্যাপারে ওরা কোনো প্রতিশ্রুতি দিল না। কিন্তু রেডিও ট্রান্সমিটার দিতে এবং সীমান্ত খোলা রাখতে রাজি হলো। শেষে বলল, 'শেখ মুজিবকে বলো, আমাদের যেন একটি চিঠি দেয়। "দিদি, হেল্প আস, মুজিব" এটুকু লিখলেই যথেষ্ট।'

আমি বললাম, তোমরা পুরো জিনিসটাই দেরি করিয়ে দিচ্ছ। আমি ঢাকায় যাব, তারপর চিঠি নিয়ে আসব, এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। ওরা বলল, 'এটা দরকার, উনি (ইন্দিরা) এটি চান।' তারা আরও বলল, 'রেডিও স্টেশন তৈরি আছে। বর্ডার খোলা থাকবে। বর্ডার পেরিয়ে যারাই আসবে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে।'

আমি যশোর হয়ে ১৪-১৫ মার্চ ঢাকায় ফিরে এলাম এবং মুজিব ভাইকে সব খুলে বললাম। বললাম, ওরা একটা চিঠি চায়। মুজিব ভাই শুনলেন, কিছু বললেন না। তারপর তো ২৫ মার্চ ক্র্যাকডাউন হয়ে গেল। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হলেন।[৬০]

ঘটনাপরম্পরায় এটি বোঝা যায় যে বঙ্গবন্ধু সামরিক বিকল্পের (মিলিটারি অপশন) কথা চিন্তা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান, একটা নেগোশিয়েটেড সেটেলমেন্ট। তিনি স্বাধীনতা চেয়েছেন, স্বাধীনতার জন্য জাতিকে তৈরি করেছেন। তিনি মনে করতেন, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নেতা। তিনি কেন বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে পরিচিত হবেন? তিনি জানতেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতার লড়াই চলবে। এটি চলেছেও। সমঝোতার মাধ্যমে পাকিস্তানে একটি কনফেডারেশন হলেও পরে বাংলাদেশ আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতো, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

বঙ্গবন্ধু যদি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলে কী হতো? এ নিয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হতে পারে। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে মনে হয়, তাঁকেও অন্যদের সঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যেতে হতো। এটি তিনি চাননি। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাঁর নিজের শর্তে, তাঁর নিজের ক্ষমতায়।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মীরা এবং আওয়ামী লীগ ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবের অবস্থানটি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এ নিয়ে জল ঘোলা হয়েছে অনেক। হয়েছে অনেক বিতর্ক ও সমালোচনা।

স্বাধীনতার ঘোষণা কে কবে কোথায় প্রথম দিয়েছেন এ নিয়ে অনেক কুতর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এই তর্কে ইতিহাসের সত্য খোঁজার চেয়ে সংকীর্ণ লাভালাভের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। একাত্তরের মার্চে সারা দেশ যেভাবে জ্বলে উঠেছিল,

একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রয়োজন হলেও তার অপেক্ষায় কেউ বসে ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে মানুষ জানতেন না যে শেখ মুজিব একটি ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন, কিংবা তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবু তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

পাকিস্তানি বাহিনী যখন আক্রমণে নামছে, তখন যে যার মতন করে বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠিয়েছেন। অনেক জায়গায় শেখ মুজিবের নামে বার্তা পৌঁছে গেছে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। দলের তরুণেরাই এ কাজটি করেছেন।

২৬ মার্চ ভোরে চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লায় আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে একটি জটলা। একজন হকার চেঁচিয়ে বলছেন :

> টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম। ঢাকা শহরত এক লাখ মানুষ মারি ফেলিয়ে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করি দিইয়ে।[৬১]

১৯৭১ সালে ভুট্টো বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনটি শক্তি—আওয়ামী লীগ, সেনাবাহিনী ও পিপলস পার্টি। নিজের পথ পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি আওয়ামী লীগকে সরিয়ে দিতে অগ্রসর হন এবং এটি করতে গিয়ে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানকে' বের করে দেন।[৬২]

১৯৭১ সালের রাজনৈতিক সংঘাত এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জন্ম হওয়াটা বাংলাদেশে একটা অনিবার্য রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখা হলেও পাকিস্তানে এ ধরনের পরিণতির জন্য সাধারণ মানুষ মানসিকভাবে তৈরি ছিল না। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান 'ভাঙার' জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং এর পেছনে ভারতের উসকানিকে যতই দায়ী করুক না কেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপলব্ধি অন্য রকমের। ১৯৯৬ সালে বছরব্যাপী পাকিস্তানের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক জনমত জরিপে জানা যায়, পাকিস্তানের অধিকাংশ নাগরিক 'ঢাকার পতন', অর্থাৎ বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাকে পাকিস্তানের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে মনে করে। পাকিস্তান ভাঙার জন্য সবচেয়ে বেশি মানুষ কিন্তু দায়ী করে ভুট্টোকে। জনমত জরিপে দেখা যায়, ৩৬ শতাংশ মানুষ মনে করে ভুট্টো পাকিস্তান ভাঙার জন্য প্রধানত দায়ী। ইয়াহিয়া খানকে দায়ী মনে করে ২৪ শতাংশ মানুষ। মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ 'পাকিস্তানের বিপর্যয়ের' জন্য শেখ মুজিবকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।[৬৩]

১৯৭৮ সালের ২৯ মে লাহোর হাইকোর্টে দেওয়া এক হলফনামায় ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের এই করুণ পরিণতির জন্য শেখ মুজিব ও ভুট্টো দুজনকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁর মতে, ভুট্টো ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু। আইয়ুব খানের কাছ থেকে ইয়াহিয়া যখন ক্ষমতা নিয়ে নেন, সেই সময়ের কথা স্মরণ করে ইয়াহিয়া বলেন, ভুট্টো ওই সময় তাঁকে বলেছিলেন, তিনি রাজনীতিটা সামাল দেবেন আর ইয়াহিয়া

**IN THE LAHORE HIGH COURT AT LAHORE**

**IN RE.-** Writ Petition No. 1649 of 1978

General (Retd) Agha Muhammad Yahya Khan,
Resident of 61-Harley Street, Rawalpindi.

... **PETITIONER**

Versus

Federation of Pakistan

... **RESPONDENT**

---

AFFIDAVIT OF General (Retd) Agha Muhammad Yahya Khan,
Resident of 61-Harley street,
Rawalpindi Cantt.

I, the deponent above-named, do hereby solemnly affirm and declare as under.-

1) That when Field Marshal Muhammad Ayub Khan, handed over power to the deponent, Mr. Zulfikar Ali Bhutto came to the deponent and suggested to become political arms of the said Mr. Zulfikar Ali Bhutto while the deponent himself would be at the head of the Armed Forces of Pakistan. Mr. Bhutto had said that in this way both of them would be able to rule the country for twenty-five years. The deponent disapproved it with contempt.

লাহোর হাইকোর্টে দেওয়া ইয়াহিয়া খানের হলফনামার প্রথম পাতা

সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বে থাকুক; এভাবে তাঁরা ২৫ বছর দেশ শাসন করতে পারবেন। ইয়াহিয়া আরও মন্তব্য করেন যে ভুট্টো যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতেন, তাহলে হয়তো একটি ফেডারেশন বা কনফেডারেশন হতো, পাকিস্তান ভাঙত না। কিন্তু ভুট্টোর বদ মতলব ছিল। তিনি সব সময় ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে চাইতেন।[৬৪]

ছয়া দফা নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন ও খন্দকার মোশতাকের ভিন্নমত ছিল বলে ইয়াহিয়ার মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

‘শেখ মুজিবের ওপর তারা দুষ্টচক্রের মতো ভর করেছিল।’ খন্দকার মোশতাক ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, ‘ছয় দফা জনগণের সামনে একটি রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি। এটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।’[৬৫]

শেষমেশ ইয়াহিয়ার ধারণা হয়েছিল, শেখ মুজিব ভারতের সাহায্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ‘বিচ্ছিন্ন’ করতে চেয়েছেন।[৬৬]

ইয়াহিয়ার শেষ জীবনটা ছিল করুণ। ১৯৭১ সালে ভুট্টো রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে ইয়াহিয়াকে অন্তরীণ করেন। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে ইয়াহিয়াকে মুক্তি দেন। স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ইয়াহিয়া পক্ষাঘাতের শিকার হন। ১৯৮০ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে ভাইয়ের বাসায় তিনি মারা যান।[৬৭]

পাকিস্তানে ১৯৭০-৭১ সালে ভুট্টোকে নিয়ে যে মাতামাতি ছিল, তা থিতিয়ে আসতে বেশি সময় লাগেনি। একটি কারচুপির নির্বাচন করে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। শেষরক্ষা হয়নি। সামরিক চক্রের সাজানো মামলায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর সন্তান বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাবার পুনর্বাসনের চেষ্টা হয়। ভুট্টোকে বানানো হয় ‘কায়েদে আওয়াম’। লারকানায় তাঁর কবর এখন রীতিমতো মাজার শরিফ।

# স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৭১ সালের ১ মার্চ জনতা রাজপথে নেমে এসেছিল, ঘোষণা করেছিল স্বাধীনতা। পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা তখন শুধু সময়ের ব্যাপার নয়, শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্ষণগণনা, কাউন্টডাউন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকেই রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামরিক জান্তা পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল। জনতার কাতারে শামিল হলেন বাঙালি পুলিশ, ইপিআর ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ব্যাটালিয়নে বাঙালি সদস্যরা বিদ্রোহ করলেন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্ব।

চট্টগ্রামে অবস্থিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের (ইবিআরসি) কমান্ড্যান্ট এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার ছিলেন প্রদেশে কর্মরত সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা। ২৪ মার্চ বিকেলে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইবিআরসির ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল)। চট্টগ্রামের বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা অনেকেই বিদ্রোহ করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন। তাঁরা সবাই ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। ২৫ মার্চ সকাল পৌনে নয়টায় ব্রিগেডিয়ার মজুমদার জয়দেবপুরের উদ্দেশে রওনা হন। ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরীর ভাষ্যে জানা যায় :

> গাড়িতে ওঠার আগে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকে বললেন, 'লাল ফিতা ওড়ানোর জন্য কর্নেল এম আর চৌধুরীকে বার্তা পাঠাও এবং তুমি এক্ষুনি চট্টগ্রামে ফেরত গিয়ে লাল ফিতা উড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে শামিল হও।'
>
> ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চলে যাওয়ার পর আমি কর্নেল ওসমানীর বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি বাসায় নেই। তাঁর বাসায় কাজের লোক আমাকে চিনত। সে আমাকে জানাল, কর্নেল ওসমানী এখন ধানমন্ডিতে একটি বাসায় আছেন।...এরপর আমি ধানমন্ডির ওই বাসায় গিয়ে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে

দেখা করি। আমাকে দেওয়া ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নির্দেশের কথা জানালাম তাঁকে এবং বললাম, লাল ফিতা উড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে আমি চট্টগ্রামে যাচ্ছি। আরও বললাম, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে আপনি চট্টগ্রাম যেতে পারলে আরও ভালো হয়। ওসমানীকে আরও বলি, আপনারা আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামে চলেন। যদি আক্রান্ত হই, পাল্টা আক্রমণ করতে পারব। ঢাকায় আমাদের এত ট্রুপস নেই।

আমার কথা শুনে তিনি ওই বাসার ওপরের তলায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর নেমে এসে বললেন, আজ (২৫ মার্চ) রাত আটটায় অথবা কাল (২৬ মার্চ) বেলা একটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিগত দশ দিনের আলাপ-আলোচনার ওপর ভিত্তি করে দিকনির্দেশনামূলক এক ভাষণ দেবেন। তাই এ মুহূর্তে কোনো হঠকারী বা অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড করা সমীচীন হবে না।...

বেলা দুইটা বা আড়াইটার দিকে আবার ইবিআরসিতে ফোন করি। কর্নেল চৌধুরীকে ফোনে পাই। প্রথমে ফোন ধরেন ইবিআরসির অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন মহসিন। কর্নেল চৌধুরীকে আমি বলি, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার লাল ফিতা উড়িয়ে দিতে বলেছেন। এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, 'এই আদেশ ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সরাসরি দিতে হবে।'[১]

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় কর্নেল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফোনের সংযোগ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাত ১২টার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২০ বালুচ রেজিমেন্ট ইবিআরসি আক্রমণ করে ২৩৫ জন বাঙালি সেনাকে হত্যা এবং ৯০০ জনের মতো গ্রেপ্তার করে। কর্নেল চৌধুরীকেও হত্যা করা হয়।[২]

ঢাকায় রাত ১০টা থেকে পিলখানায় ২২ এফএফের সদস্যরা ইপিআরের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে। ইপিআর কন্ট্রোল রুম থেকে মেজর দেলওয়ার ও কুতুবুদ্দীন ওয়্যারলেসে অনবরত বার্তা পাঠাতে থাকেন, 'যে যেখানে আছ, তোমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশনে যাও।' তাঁরা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত বার্তা পাঠান। তারপর তাঁদেরও নিরস্ত্র করা হয়।[৩]

রাত ১০টার দিকে চট্টগ্রামে ইপিআরের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বার্তাটি পান। তখনই তিনি অ্যাকশনে চলে যান। তিনি ওয়্যারলেসে বার্তা পাঠান 'ব্রিং সাম উড ফর মি'। এই বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধীনে সবাই বিদ্রোহ করেন।[৪] ক্যাপ্টেন রফিকের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ২৫ মার্চ রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে ইপিআরের ওয়্যারলেস স্টেশনের দায়িত্বে থাকা অবাঙালি প্লাটুন কমান্ডার ক্যাপ্টেন হায়াতকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন।[৫] ২৬ মার্চ সকালে তিনি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর বিবরণী এ রকম :

টেলিফোনে আমি জনাব হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব সিদ্দিকীকে অনুরোধ করলাম, চট্টগ্রাম শহরে আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি বিষয়টি জনগণকে জানানোর জন্য তাঁরা যেন রেডিওতে একটি ঘোষণার বন্দোবস্ত করেন। সেই অনুযায়ী আওয়ামী লীগ নেতারা একটি খসড়া তৈরি করেন এবং তা সংশোধন করে দিলেন ডা. জাফর।...২৬ মার্চ আনুমানিক ২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম শহরের কয়েক মাইল বাইরে কালুরঘাট রোডস্থ চট্টগ্রাম রেডিওর 'ট্রান্সমিশন সেন্টার' থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জনাব এম এ হান্নান এই ঘোষণা বাণীটি পাঠ করেন।[৬]

রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রামে অবস্থিত কালুরঘাট ট্রান্সমিশন কেন্দ্রটিকে বেতারের একদল কর্মী ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাম দিয়ে কিছু অনুষ্ঠান চালান এবং সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

২৬ মার্চ...আমরা কালুরঘাট গিয়ে জানতে পারলাম যে জিয়াউর রহমান (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর) বোয়ালখালী থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা মেজর জিয়াউর রহমানকে বোয়ালখালী থানার কুসুমডাঙ্গা পাহাড়ের কাছে তাঁর জওয়ানদেরসহ দেখতে পাই; তাঁকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই এবং শহরসংলগ্ন এলাকায় শিবির স্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাই। তবে ২৭ মার্চ তিনি কালুরঘাটে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাপ্তাই থেকে আগত ক্যাপ্টেন হারুন ও ১৫০ জন ইপিআর মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে একত্র হন।

কালুরঘাট থেকে চলে আসার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রেডিও মারফত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ মার্চ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা করি। প্রচারে আমাকে সহযোগিতা করেন রেডিও অফিসের রাখাল চন্দ্র বণিক, মীর্জা আবু মনসুর, আতাউর রহমান কায়সার, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ এমপিএ ও এমএনএ।

২৭ মার্চ বিকেলে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেদিন রাতে আমি, মীর্জা আবু মনসুর ও মোশাররফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত সাবেক মন্ত্রী এ কে খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পুনর্ঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি থেকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে আমি এ কে খান কর্তৃক লিখিত

খসড়াটি দিই। পুনরায় ২৮ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৭]

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম আর সিদ্দিকীর ভাষ্যও প্রায় একই রকমের। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> ...২৭ মার্চ জিয়া বেতারে ভাষণ দেন, নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন, মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানান। এটি আওয়ামী লীগার ও জনগণকে বিভ্রান্ত করে। খবরটি শুনে এ কে খান বলেন, এটিকে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে মনে করা হতে পারে এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোনো সমর্থন পাওয়া যাবে না। তিনি ইংরেজিতে একটি খসড়া তৈরি করে দেন। জিয়া ভুল বুঝতে পারেন এবং নতুন খসড়াটি পাঠ করেন, যাতে উল্লেখ করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পক্ষে তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন।[৮]

চট্টগ্রাম রেডিও থেকে এম এ হান্নানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ এবং এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম সম্পাদক ও চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী প্রসঙ্গে একটি ভাষ্য পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের স্টেশন রোডে রেলওয়ে রেস্ট হাউসের একটি কামরায় ছিল শহর আওয়ামী লীগের অফিস। ওই কামরার ভেতর পার্টিশন দিয়ে একটি জায়গা করা হয়েছিল। জহুর আহমদ চৌধুরী মাঝেমধ্যে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করতেন। ২৫ মার্চ রাতে তাঁর ভীষণ জ্বর হয়েছিল। জ্বর গায়ে তিনি পাথরঘাটায় আখতারুজ্জামান বাবুর বড় ভাই বশীরুজ্জামানের বাসভবন জুপিটার হাউসে যান। ২৬ মার্চ সকালে হান্নান রেলওয়ে রেস্ট হাউসে জহুর আহমদকে না পেয়ে জুপিটার হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতার বক্তব্য রেডিওতে এসে পাঠ করতে অনুরোধ করেন। হান্নানের ধারণা হয়েছিল, জহুর আহমদ চৌধুরী রেডিওতে বক্তব্য দিলে সেটার 'ওজন অনেক বেশি হবে'। জহুর আহমদ তখন জ্বরে কাহিল। তিনি হান্নানকে বললেন, 'তুমিই এইটা পড়ো।'[৯]

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল সকাল ১০টায় বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা যে আজ বাংলাদেশের সার্বভৌম গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারছি, সে সুযোগ এ দেশের জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম অনেক দিন থেকে শুরু হয়।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে শেখ মুজিব এটি স্পষ্ট করেন যে স্বাধীনতা হুট করে আসেনি। এর পেছনে আছে জনগণের দীর্ঘদিনের লড়াই। ২৫ মার্চ রাতে প্রতিরোধযুদ্ধের প্রথম প্রহরটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

বর্বর ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীকে অসহায় ও নিরস্ত্র সাত কোটি বাঙালির ওপর কুকুরের মতো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ঘোষণা করত, তবে আমরা সেই যুদ্ধের মোকাবিলা করতে পারতাম। কিন্তু তারা অতর্কিতে ২৫ মার্চ তারিখে আমাদের আক্রমণ করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ খবর প্রত্যেককে পৌঁছে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে।

দেশবাসী জানেন একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার ওপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকত, তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো?[১০]

শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদের বরাত দিয়ে কেউ কেউ বলেন, তাজউদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণার একটি খসড়া তৈরি করে শেখ মুজিবের অনুমোদন নিতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব এতে রাজি হননি। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কোনো সুযোগ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে দিতে চাননি। ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধটা ওরাই শুরু করুক। তাজউদ্দীন জীবিতকালে এ প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি। অন্যরাও এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজ মুখে বা নিজ হাতে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিয়ে থাকলে তিনি স্বাধীনতা চাননি বা অখণ্ড পাকিস্তান চেয়েছিলেন বলে একটি মহলের প্রচারণা আছে। ২৫ মার্চ মাঝরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ ও নৃশংসতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো বিকল্প ছিল না। তর্ক হচ্ছে এই নিয়ে যে, বঙ্গবন্ধু নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কি দেননি, এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

আমরা (ভারত) এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলাম, যখন ভেবেছিলাম যে, আমরা অনেক সহজে ও তাড়াতাড়ি সামনে এগোতে পারব। তখন হঠাৎ করেই অন্য দেশের সমস্যা আমাদের ওপর এসে পড়ল। এটা আমাদের সমস্যা নয়, বরং অন্য একটি দেশের। ওরা মানুষদের সীমান্তের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে, যারা তাদের পছন্দমতো ভোট দেয়নি। তাদের একটাই অপরাধ, তারা স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলেছে। যদিও তারা তা করেছে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে

যাওয়ার পর, তার আগে নয়। যদ্দুর আমি জানি, তিনি নিজে স্বাধীনতা চাননি। কিন্তু যখন তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছিল, এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষেরা বলছে, 'এরপর, আমরা একসঙ্গে থাকি কী করে? আমাদের আলাদা হতেই হবে।'[১১]

বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা তৈরি হয়েছিল বলে তাঁর সে সময়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন যুবনেতা সিরাজুল আলম খান নিশ্চিত করেছেন। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য হলো, তিনি তিন লাইনের একটি খসড়া ইংরেজিতে তৈরি করেন। তাজউদ্দীন এটি পরিমার্জন করে দেন। সন্ধ্যায় এটি শেখ মুজিবকে দেখানো হয়। তারপর এটি প্রচারের ব্যবস্থা হয়। শেখ মুজিব জানতেন, তাঁর নামে একটি ঘোষণা তৈরি করা হয়েছে। সিরাজুল আলম ২৫ মার্চ রাতের কোনো এক সময় লালবাগ থানার পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কামরায় গিয়েছিলেন। ওই কর্মকর্তার টেবিলের ওপর তিনি ওই ঘোষণার একটি কপি দেখেছিলেন। তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধু সরাসরি নিজেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কি দেননি, এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, তাঁর নামে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।[১২] শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর শেষবার দেখা হয় ধানমন্ডির বাসায় রাত ১১টায়। ততক্ষণে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে শহরে ঢুকে পড়েছে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান বিল গৃহীত হওয়ার পর এক ভাষণে শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাতের কথা স্মরণ করে বলেন :

যখন আমি বুঝতে পারলাম, আমার আর সময় নেই এবং আমার সোনার দেশকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো, এই বুঝি আমার শেষ। তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম, কেমন করে বাংলার মানুষকে এ খবর পৌঁছিয়ে দিই এবং আমি তা দিয়েছিলাম তাদের কাছে।[১৩]

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের প্রথম সমন্বিত বিদ্রোহ শুরু হয় ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে। চট্টগ্রামে অবস্থানরত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহে যোগ দেন ওই রেজিমেন্টের সব বাঙালি কর্মকর্তা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী, ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন, লেফটেন্যান্ট সমশের মুবিন চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট মাহফুজুর রহমান। এর আগেই ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বিদ্রোহ করেন।[১৪]

২৫ মার্চ রাতে কী ঘটেছিল, তার একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামানের (পরবর্তী সময়ে ব্রিগেডিয়ার) বর্ণনায়। রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুর

রশিদ জানজুয়ার নির্দেশে ২৫ মার্চ সকাল থেকে মেজর মীর শওকত আলী এক কোম্পানি সেনা নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের কাজের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আনসারিও সেখানে ছিলেন। সন্ধ্যার পর জানজুয়া ও শওকত শহরে রেজিমেন্টের ইউনিট লাইনে ফিরে আসেন। রাত ১০টার পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের ভাষ্যে জানা যায় :

> জানজুয়া আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'খালেক, ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য পোর্ট টু টেক ওভার কমান্ড অব দ্য এরিয়া।' এমন সময় মেজর জিয়া সেখানে উপস্থিত হন। জিয়াকে দেখেই জানজুয়া বললেন, 'জিয়া, ইউ গো ফার্স্ট, খালেক উইল ফলো ইউ।' জিয়া উঠলেন। সঙ্গে দুজন অবাঙালি অফিসার, সে. লে. হুমায়ুন আর সে. লে. আজম। আমি ওপাশে গেলাম। জিয়া বললেন, 'খালেকুজ্জামান, কিছু শুনলে জানিয়ো।'
>
> গাড়ি চলে গেল। জানজুয়া তাঁর বাসা আলহামরা বিল্ডিংয়ে চলে গেলেন। শওকত চলে গেলেন মেসে। ডিউটি অফিসার ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (পরে কর্নেল) চলে গেল ওপরে। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন অলি ওপর থেকে বলল, 'স্যার, আপনার একটা ফোন আসছে।' আমি গেলাম। বাই দ্যাট টাইম অলি হ্যাজ টক্‌ড। উনি ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক মি. কাদের (আবদুল কাদের)। অলির সঙ্গে কী কথা হয়েছে জানি না। বললেন, 'ঢাকায় তো ইপিআরের ওখানে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেছে। আর্মি হ্যাজ রেইডেড ক্যাম্পস। তোমরা কী করছ?' আরও কিছু বললেন। আমাকে এক্সাইটেড করলেন। আমি অলিকে বললাম, তোমাকে কী বলেছে জানি না। ডিউটি করো ওখানে। কিপ আ ট্র্যাক অন দিস। আই অ্যাম গোয়িং টু গেট ব্যাক আওয়ার বস জিয়া।
>
> পিক আপ এল। আমি কয়েকজন গার্ড নিলাম। জিয়াকে দেওয়ানহাট ওভারব্রিজের সামনে পেলাম। রাস্তায় ব্যারিকেড ছিল। ওখানে আল্লাহর রহমতে ওইটা (ব্যারিকেড) ছিল। জিয়া, লাইক আ ড্যান্ডি ম্যান, স্মার্ট, হাতে ফিল্টার উইলস, দ্যাট ফেমাস উইলস। সিগারেট খাচ্ছেন। বললেন, 'ইয়েস খালেক, হোয়াট হ্যাপেনড? আই সেইড, ফায়ারিং হ্যাজ স্টার্টেড। ইপিআর ক্যাম্প হ্যাজ বিন অ্যাটাকড... ব্লা ব্লা ব্লা।' উনি তখন চিৎকার করে বললেন,
>
> হোয়াট শ্যাল উই ডু?
>
> ইউ নো বেটার।
>
> ইন দ্যাট কেস, উই রিভোল্ট অ্যান্ড শো আওয়ার এলিজিয়েন্স টু দ্য গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ।
>
> ইউনিট লাইনে ফিরে আসার পর ল্যান্স নায়েক শফির হাত থেকে রাইফেলটা হাতে নিয়ে বললেন, 'হুমায়ুন, আজম, কাম এলংগ। শফি, তোমার

স্যারদের কোয়ার্টার গার্ডের ভেতর নিয়ে যাও।' দে অয়ার স্টান্ট। কোয়ার্টার গার্ডের ভেতরে নিয়ে গেল। জিয়া বললেন, 'খালেক, লেট মি গো অ্যান্ড গেট দিস বাস্টার্ড (জানজুয়া)।' জিপে করে আলহামরা বিল্ডিংয়ে গেলেন। জানজুয়া কেইম আউট। জিয়া জানজুয়াকে বললেন :

খালেক অ্যান্ড অলি উড লাইক টু টক টু ইউ। ইউ কাম টু দ্য ইউনিট লাইন। দে আর ওয়েটিং ফর ইউ টু টক।

চলো, চলতা হু।

জানজুয়াকে গাড়িতে বসালেন। জিয়া গাড়ি চালালেন। পেছনে যে সিপাই ছিল, সে বন্দুক ধরে রেখেছিল, সো দ্যাট হি ডাজ নট রান অ্যাওয়ে। (ইউনিট লাইনে) নামার সঙ্গে সঙ্গে জিয়া এক আজব কাণ্ড করলেন। ওখানে শফি ছিল। তার হাত থেকে রাইফেলটা নিলেন, পয়েন্টেড দ্য ব্যারেল অ্যাট হিম। বললেন, 'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' জানজুয়া হতভম্ব হয়ে গেছে। (জিয়া) বললেন, 'খালেক, টেক হিম।' আমি জানজুয়াকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে গেলাম। বাই দ্যাট টাইম কোয়ার্টার গার্ডের মধ্যে সে. লে. আজম, সে. লে. হুমায়ুন, আহমেদ দ্বীন বলে একজন ক্যাপ্টেন, পাঞ্জাবি অফিসার। আজম, হুমায়ুন, আহমদ দ্বীন অয়ার টেকেন আপ। অ্যান্ড দে অয়ার এলিমিনেটেড ইন দ্য মেল্যু।

মেজর জিয়া সার্বিক পরিস্থিতি বলে সবার কাছ থেকে আনুগত্য চাইলেন, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আছ'? সবাই এক আওয়াজে বলেছিল, 'আমরা আছি।'

জিয়া শওকতকে বলেছিলেন, 'একটি গাড়ি নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে মাইক দিয়ে বলে দাও যে আমরা, এইট বেঙ্গল হ্যাজ রিভোল্টেড ফর দ্য কজ অব বাংলাদেশ।' বিফিটিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলার জন্য। হি ডিড দ্যাট। জিয়া অফিসে বসে...হি ওয়াজ রিংগিং আপ—এমপি, ডেপুটি কমিশনার আর যাদের ফোন করে পায় নাই, অপারেটরকে বলেছেন, 'সবাইকে বলে দিন এইট বেঙ্গল রিভোল্ট করেছে বাংলাদেশের পক্ষে।'

তারপর আমরা ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে গেলাম। তখন রাত গড়িয়ে ভোর হয়ে গেছে। আমরা পটিয়া পর্যন্ত যাই। তখন কিছু কিছু অফিসার ডেপ্লয়েড হয়ে গেছেন। পটিয়া যেহেতু অলির জায়গা, তিনি সবকিছু চিনতেন। এতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। বন্দোবস্তটা উনি ভালোভাবেই করতে পেরেছিলেন। সেখান থেকে আমাদের বলে দেওয়া হলো, পজিশন, কে কোথায় যাবেন। আমাকে বলা হলো রেডিও স্টেশনটা প্রটেকশন দেওয়ার জন্য, রেডিও স্টেশন থেকে কর্ণফুলীর পূর্বপার পর্যন্ত।[১৫]

২৬ মার্চ সন্ধ্যায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের স্ক্রিপ্ট রাইটার বেলাল মোহাম্মদ কয়েকজনকে নিয়ে বেতার কেন্দ্র চালু করেছিলেন। সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে তাঁর

কণ্ঠস্বর শোনা যায়—স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। বেলাল মোহাম্মদের বিবরণ থেকে জানা যায়, সন্ধ্যার এই অধিবেশন চলাকালে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান এসে হাজির হন এবং বলেন, 'আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করব।' তাঁকে বলা হলো, তিনি নিজ কণ্ঠে এটি পাঠ করতে পারেন, তবে তাঁর নাম প্রচার করা হবে না। কেননা বেতার কেন্দ্রটি তাহলে ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। জবাবে হান্নান বলেন, তিনি দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে নামসহ এটি পাঠ করেছেন। এখন অবশ্য বক্তব্যটি একটু বড় করে লেখা হয়েছে। শেষমেশ হান্নান নাম ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন।[১৬]

জিয়া যখন ব্যাটালিয়নের কমান্ড হাতে নেন, তখন তাঁর সম্বল বলতে ৩০০ সেনা। পরদিন তাঁরা হাঁটাপথে পটিয়া থানায় যান। তাঁরা খোঁজখবর নিতে থাকেন শেখ মুজিব বা তাঁর কোনো সহযোগী বেতারে কোনো ঘোষণা দিয়েছেন কি না বা তাঁদের জন্য কোনো নির্দেশ আছে কি না। তাঁদের সঙ্গে চক্ষু চিকিৎসক জাফর, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এবং কয়েকজন ছাত্রনেতার যোগাযোগ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা আসেনি। সবাই তখন শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন। এ সময় জনৈক মাহমুদ হোসেন ক্যাপ্টেন অলির খোঁজে পটিয়া আসেন। তিনি অলিকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে তাঁর ভালো যোগাযোগ আছে এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সপ্তম নৌবহর থেকে বিমান, ভারী অস্ত্রসহ অন্যান্য সাহায্য পাওয়া যাবে। মাহমুদ তাঁদের বলেন, তিনি চট্টগ্রাম বেতারের অনেক কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীকে চেনেন। অলি তখন ওই কর্মকর্তাদের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য মাহমুদকে অনুরোধ করেন। মাহমুদ তখনই একটি মাইক্রোবাস নিয়ে চলে যান এবং বেলা একটায় বেতারের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল ফারুক, কাজী হাবীব উদ্দিন আহমদ, জাহেদুর হোসেন, আমিনুর রহমান, সৈয়দ আবদুল সরকার, শফিকুজ্জামান, মোস্তফা আনোয়ার ও রেজাউল করিম চৌধুরী।[১৭]

মাহমুদ হোসেন চট্টগ্রাম বেতারের স্ক্রিপ্ট রাইটার বেলাল মোহাম্মদকে নিয়ে এসেছিলেন বেগম মুশতারী শফীর বাসা থেকে। মুশতারী শফীর ভাষ্য অনুযায়ী :

> ...মাহমুদ হোসেন নামের একজন লোক এল আমার বাসায় বেলাল ভাইকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে। মাহমুদ হোসেন ভারতীয় লোক। থাকে কখনো লন্ডন কখনো আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়। তাঁর স্ত্রী নাকি ভারতের (জনতা পার্টির)

> নেতা মোরারজি দেশাইয়ের ভাইজি। নাম ভাস্কর প্রভা। তিনি প্রায় মাস কয়েক হলো বাংলাদেশে এসেছেন। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের পল্লিগীতি ও বাউল সংগীতের ওপর ধারাবর্ণনাসহকারে লং প্লে রেকর্ড বের করবেন। বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছে সংগৃহীত গানের ধারাবর্ণনা লিখে দেওয়ার। উঠেছে আগ্রাবাদ হোটেলে।...বেলাল ভাই চলে গেলেন মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে। আবুল কাশেম সন্দ্বীপ আর আবদুল্লাহ আল ফারুক পরে হেঁটেই রওনা হলো... ।[১৮]

পটিয়া থেকে কালুরঘাটের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। বেলা দুইটায় জিয়া ও অলি বেরিয়ে পড়লেন। অলি পথে ফুলতলা প্রাইমারি স্কুলে থামলেন। মাহমুদ হোসেন ও বেতার কর্মীদের নিয়ে জিয়া বেতার কেন্দ্রের দিকে রওনা হলেন। অলি বোয়ালখালী হয়ে বিকেল সোয়া পাঁচটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে পৌঁছান। মেজর জিয়া একটি ঘোষণার খসড়া তৈরি করে রেখেছিলেন। তিনি ঘোষণাটি পাঠ করেন। ওই সময় অলি পাশেই ছিলেন।[১৯]

বেলাল মোহাম্মদ দাবি করেছেন, তিনিই জিয়াকে 'স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার' করার প্রস্তাব দিলে জিয়া রাজি হন এবং তাঁর দেওয়া কাগজে জিয়া বক্তব্যের খসড়াটি লেখেন। বেতারের অফিসকক্ষে তখন তাঁরা মাত্র দুজনই ছিলেন। পরে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ বাইরে থেকে এসে পাশে বসেছিলেন। তিনজনের আলাপ-আলোচনায় খসড়াটি চূড়ান্ত হয়েছিল।[২০]

লে. সমশের মুবিন চৌধুরীকে বেতার কেন্দ্রের দায়িত্বে রেখে জিয়া ও অলি রাত পৌনে আটটায় কালুরঘাট ছেড়ে যান। ওই রাতেই তাঁরা মাহমুদ হোসেনকে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কক্সবাজার রওনা করিয়ে দেন। কয়েকজন সেনাও দেওয়া হয় তাঁর সঙ্গে। ২৮ মার্চ সকালে জিয়া ও অলি একটি জিপে চড়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা হন। পথে তাঁরা স্থানীয় লোকদের বাধার মুখে পড়েন। তাঁদের গায়ে সামরিক পোশাক ছিল, যদিও তাঁরা ব্যাজ খুলে ফেলেছিলেন। মানুষ তাঁদের পলায়নপর পাকিস্তানি সেনা ভেবে ঘেরাও করে ফেলে। গতিক সুবিধের নয় দেখে অলি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলেন, 'আঁরঅ বাড়ি চন্দনাইশ। এই হলো মেজর জিয়া, যাঁর ঘোষণা আপনারা রেডিওতে শুনেছেন।' এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। তারা তাঁদের গায়ে ফুল ও গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়। এরপর তাঁরা আবার অগ্রসর হন। পথে আর কোনো ঝামেলায় যাতে না পড়তে হয়, সে জন্য জিপের বনেটের ওপর কক্সবাজারের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সরোয়ার আলমকে বসিয়ে রাখা হয়। জিয়া নিজেই জিপটি চালাচ্ছিলেন। পাশের আসনে অলি। ডুলাহাজারায় পৌঁছে তাঁরা স্থানীয় লোকদের কাছে জানতে পারেন মাহমুদ তাঁর সঙ্গে থাকা

সেনাসহ স্থানীয় জনতার হাতে নিহত হয়েছেন। অবাঙালি মনে করে তাঁদের হত্যা করা হয়।[২১]

মাহমুদ কক্সবাজারে একজন উকিলের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। সেই মোতাবেক জিয়া ও অলি ওই উকিলের বাসায় যান এবং জানতে পারেন, ওই উকিলের ছেলে তিন দিন আগেই আমেরিকায় চলে গেছেন। ধারে-কাছে কোথাও সপ্তম নৌবহর নেই। তাঁরা চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।[২২] ৩০ মার্চ জিয়া কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে যান এবং তাঁর দ্বিতীয় ঘোষণাটি দেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ১০ জন সেনাকে নিয়ে জিয়া রামগড় রওনা হন। উদ্দেশ্য হলো, ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জোগাড় করা।[২৩]

অনেক বছর আগের ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতি থেকে তুলে আনতে গেলেও দেখা যায় তাতে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। স্মৃতিও কিছুটা ঝাপসা হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও তাই অসংগতি পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালের মার্চের শেষ দিনগুলো নিয়ে অলি আহমদ, চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও সমশের মুবিন চৌধুরীর দেওয়া তথ্যে কিছু অমিল দেখা যায়। চৌধুরী খালেকুজ্জামানের ভাষ্য অনুযায়ী, জিয়া, মীর শওকত, অলি আহমদ এবং তিনি ২৬ তারিখ বিকেলে কক্সবাজার রওনা হন। তাঁরা রাতে কক্সবাজারে ছিলেন। সেখানে তাঁরা ডিসি, এসপি ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। ২৭ তারিখ তাঁরা ফিরে আসেন চট্টগ্রামে। অলি আহমদ বলছেন, জিয়া, শওকত এবং তিনি ২৮ মার্চ কক্সবাজারে যান। জিয়া ও অলি ৩০ মার্চ চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। মীর শওকত থেকে যান কক্সবাজারে। সমশের মুবিন চৌধুরীর ভাষ্য হলো, জিয়া ২৮ মার্চ সকালে সারা দিনের জন্য পটিয়া ছেড়ে যান। সমশের জানতেন না তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। তবে তাঁর ধারণা হয়েছিল, জিয়া ভারতের বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বান্দরবান গিয়ে থাকতে পারেন। জিয়া রাতেই ফিরে এসেছিলেন এবং রাত ১১টার পর তাঁর সঙ্গে সমশেরের কথা হয়।[২৪]

সমশের মুবিন চৌধুরী লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২৬ মার্চ ভোরে তাঁরা পটিয়া পৌঁছার পর একটি জিপে করে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী, আতাউর রহমান কায়সার এবং ছাত্রলীগের কয়েকজন আসেন। জিয়াউর রহমান তাঁদের কাছে জানতে চান, কোনো 'ইনস্ট্রাকশন' আছে কি না? জহুর বলেন, তেমন কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই। সিগারেটের একটা খোলা প্যাকেট দেখালেন। সেখানে লেখা, 'গো আন্ডারগ্রাউন্ড।' জিয়া বললেন, 'ঠিক আছে, উই আর টুগেদার, যুদ্ধ করব।' ইতিমধ্যে ইপিআরের ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী কাপ্তাই থেকে ৬৫ জন সিপাই নিয়ে এসেছেন। ক্যাপ্টেন রফিকের একটি

বার্তা পেয়ে চলে এসেছেন। সন্ধ্যার সময় অষ্টম বেঙ্গলের সাতজন অফিসার এবং ক্যাপ্টেন হারুন 'জয় বাংলা' বলে শপথ করলেন, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে সর্বস্ব ত্যাগ করবেন। মীর শওকত আলী লুঙ্গি পরে রিকশায় চড়ে শহর ঘুরতে গেলেন। সমশের মুবিনও শহরে গিয়েছিলেন। জিয়া সমশেরের অধীনে এক কোম্পানি সেনা ন্যস্ত করলেন। ২৭ মার্চ বিকেলে সমশের কালুরঘাট ব্রিজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ব্রিজের ওপর মীর শওকত ও আতাউর রহমান কায়সার বসে কথা বলছিলেন। শওকত সমশেরকে বললেন, 'দেখায়া দিছে, ঘোষণা দিয়া দিছে।' সন্ধ্যার একটু আগে সমশের রেডিওতে শুনলেন, 'আই, মেজর জিয়া, হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্য ইনডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ...।' ২৮ তারিখ ভোরে সমশের মুবিনকে ডেকে জিয়া তাঁর হাতে লেখা একটি খসড়া দিয়ে বললেন, 'রিপিট দিস হোল ডে।' সমশের মুবিনের ভাষ্য অনুযায়ী :

> যৌবন বয়স, দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে জড়িত হব, এই সুযোগ ছাড়ে নাকি কেউ! সুবিদ আলী ভুঁইয়া বলল, সেও যাবে আমার সঙ্গে। আমরা কালুরঘাট গেলাম দশটার দিকে। ওটা ছিল একটি ট্রান্সমিশন সেন্টার, নট আ রেডিও স্টেশন। টেকনিশিয়ান যারা ছিল, ডাকলাম সবাইকে। বললাম, অন বিহাফ অব মেজর জিয়া, আই রিড আউট দ্য ফলোয়িং ডিক্লারেশন। এটা সারা দিন বিশ-পঁচিশবার পড়েছি। এক ঘণ্টা পরপর ট্রান্সমিটার অফ করতে হয়। গরম হয়ে যায় তো! প্রতিটি ওয়ার্ড আমার মনে আছে, জীবনে ভুলব না।
>
> আই, মেজর জিয়া, হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্য ইনডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ। উই আর নাউ ফাইটিং ফর আওয়ার ইনডিপেনডেন্স। ইন দিস উই হ্যাভ জয়েন্ড মেম্বারস অব দ্য আর্মড ফোর্সেস, পুলিশ, ইপিআর অ্যান্ড অল পিপল অব বাংলাদেশ। আই অ্যাপিল টু অল বাংলাদেশিজ ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড টু জয়েন আস ইন আওয়ার ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স। আই অ্যাপিল টু অল পিস-লাভিং কান্ট্রিজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড টু রিকগনাইজ দ্য নিউ কান্ট্রি অব বাংলাদেশ। আন্ডার দ্য সারকামস্ট্যানসেস আই ডিক্লেয়ার মাইসেলফ প্রভিশনাল হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ। ইনশাআল্লাহ, ভিক্টরি উইল বি আওয়ার্স। জয় বাংলা।
>
> ওনার হাতের লেখা রিপিট করছিলাম। এটি করতে করতে দুপুরে টেলিফোন আসে, হান্নান সাহেব কথা বলবেন, লোকাল আওয়ামী লীগ লিডার।
>
> ভাই, আমি হান্নান বলছি।
>
> হ্যাঁ হান্নান ভাই, বলেন।
>
> এর আগে ২১ তারিখ আওয়ামী লীগারদের সঙ্গে আমাদের একটি মিটিং হয়েছিল। ওখানে হান্নান ভাই ছিলেন।
>
> এটা তো ভালো করছেন, ঘোষণা দিয়ে দিছেন। দরকার ছিল। একটাই তো সমস্যা। বঙ্গবন্ধুর নাম নাই। বঙ্গবন্ধু কথাটি আমরা চাই।

হ্যাঁ হান্নান ভাই, কী করতে হবে বলেন।

আমাদের কাছে অবভিয়াসলি লিডার ওয়াজ শেখ মুজিবুর রহমান। অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই।

এখানে বঙ্গবন্ধুর নাম আনতে হবে, এই মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। দিস ওয়ার অব লিবারেশন ইজ ফট আন্ডার দ্য গাইডেন্স অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

হান্নান ভাই, আমি লিখে নিলাম বিষয়টি। জিয়াউর রহমানকে না বলে তো আমি এটা পড়তে পারি না। দিস ইস হিজ ডিক্লারেশন। কথা বলব। আপনারাও তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। অ্যান্ড হোয়াই নট, এটা হবে না কেন?

ওই রাতে আই মেট হিম এগেইন ইন পটিয়া। অনেক রাতে, এগারোটার পরে। আমি বললাম, স্যার, দিস ইজ দ্য সাজেশান ফ্রম আওয়ামী লীগ সাইড। বললেন, 'পারফেক্টলি অল রাইট। উই হ্যাভ টু ইউজ হিজ নেম।'[২৫]

২৯ মার্চ সমশের ও হারুনকে জিয়া চকবাজারে যুদ্ধ করতে পাঠান। ওই দিনই আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে জিয়ার বৈঠক হয়। নেতাদের মধ্যে ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী ও আতাউর রহমান কায়সার। স্বাধীনতার ঘোষণাটি 'রিকাস্ট' করা হয়। ৩০ তারিখ বেলা ১১টায় কালুরঘাট বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে পরিমার্জিত ঘোষণাটি পাঠ করেন জিয়া, 'অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমান...।'[২৬]

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। জিয়া এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পুরো ব্যাপারটিই ছিল আকস্মিক। ঘোষণার খসড়াটি জিয়া লিখেছিলেন ইংরেজিতে। কীভাবে লিখেছিলেন? জিয়ার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা একটি প্রবন্ধে লেখক মনজুর আহমেদ তুলে ধরেছেন এ খসড়ার ইতিবৃত্ত। লেখাটি ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ *দৈনিক বাংলায়* ছাপা হয় :

এই বিরাট শক্তির (পাকিস্তানি বাহিনী) মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না এ কথা বাঙালি সেনারা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাওয়ার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে কথা জানিয়ে যাওয়ার জন্য মেজর জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

কিন্তু কী বলবেন তিনি? একটি করে বিবৃতি লেখেন আবার তা ছিঁড়ে ফেলেন। কী জানাবেন তিনি বিশ্ববাসী ও দেশবাসীকে বেতার মারফত? এদিকে বেতারকর্মীরা বারবার ঘোষণা করছিলেন আর পনেরো মিনিটের মধ্যে মেজর জিয়া ঘোষণা দেবেন। কিন্তু পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল। মেজর জিয়া মাত্র তিন লাইন লিখতে পেরেছেন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা বোঝবার

নয়। বিবৃতি লেখায় ঝুঁকিও ছিল অনেক। ভাবতে হচ্ছিল শব্দচয়ন, বক্তব্য পেশ প্রভৃতি নিয়ে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা মুসাবিদার পর তিনি তৈরি করেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি। নিজেই সেটা বাংলা ও ইংরেজিতে পাঠ করেন।...

৩০ মার্চ সকালে মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র) থেকে আরেক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই দিনই দুটি পাকিস্তানি বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।'[২৭]

জিয়া রেডিওতে তাঁর প্রথম ঘোষণায় নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম বলেন, 'এটি সম্ভবত সে সময়ের উত্তেজনাকর মানসিক অবস্থায় অসাবধানতার কারণেই হয়েছিল এবং এটি একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল।'[২৮]

জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিবাচক। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সভায় সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রিপোর্টে বলা হয়:

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামে রত মেজর জিয়াউর রহমান বেতার মারফত বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন এবং বাংলাদেশে গণহত্যা রোধ করতে সারা পৃথিবীর সাহায্য কামনা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানতে পেরে বাংলার মানুষ এক দুর্জয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলল।[২৯]

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম বাক্যটিই হলো: 'আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি...।'[৩০] সংবিধানের এই বাক্যটির অর্থ ও তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার।

পল্টন ময়দানে জনসভায় মওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তথ্য হিসেবে এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিন্তু তাঁদের ঘোষণা শুনে তো বাঙালির প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়নি। জনগণের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সত্তরের নির্বাচনে তিনি জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন। জনগণের পক্ষে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দর-কষাকষি কিংবা স্বাধীনতা ঘোষণা করার বৈধ অধিকার ছিল তাঁরই। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব,

বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদ এটি ভালোই জানতেন। দিল্লিতে তিনি নিজেকে শেখ মুজিবের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবেই উপস্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে শেখ মুজিব স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বাঙালির অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। একই সঙ্গে বাস্তব ঘটনাবলির প্রতিফলন ছিল তাঁর বেতার ভাষণে। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন :

> ২৫ মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তাঁর রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন, তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।...
>
> হাজার হাজার মানুষ আজকের এই স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআরের বীর বাঙালি যোদ্ধারা এই স্বাধীনতাসংগ্রামের যে যুদ্ধ তার পুরোভাগে রয়েছেন এবং তাঁদের কেন্দ্র করে পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ, আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্য হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন।...
>
> প্রতিদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর শক্তি বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, তেমনি শত্রুর আত্মসমর্পণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর একই সঙ্গে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেড়ে নেওয়া হাতিয়ার। এই প্রাথমিক বিজয়ের সঙ্গে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।[৩১]

তাজউদ্দীন তাঁর বেতার ভাষণে মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর আবু ওসমান, মেজর আহমদ, মেজর নওয়াজেশ ও মেজর নাজমুল হকের নাম উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাজউদ্দীনের এই ঘোষণা অবরুদ্ধ বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মনে আশা জাগিয়েছিল, তাদের সাহস জুগিয়েছিল। একই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছিল যে বাংলাদেশে একটি বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সরকার 'বিদেশি বন্ধুরাষ্ট্রগুলো'র কাছে শর্তহীন সমর্থন, সহানুভূতি ও অস্ত্র সাহায্য চাইছে।[৩২]

১৫ মার্চের মধ্যে এটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বাংলাদেশের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি শেখ মুজিবের হাতে। ২৫ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ মানুষের

হৃদয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল শুধুই একটি আইনি ব্যাপার। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে পরবর্তীকালে যে বিতর্ক হয়েছে, তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বড় সত্য হলো একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেখ মুজিবের পেছনে জনগণের ম্যান্ডেট ছিল এবং স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার ছিল একমাত্র তাঁরই। অন্য কেউ এই ঘোষণা দিয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে এটি শেখ মুজিবের নামেই দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববাসীর চোখে শেখ মুজিবই ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিকদের বৈধ প্রতিনিধি এবং নেতা।[৩৩]

১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রটি ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে পাঠ করা হয়। ঘোষণাপত্রের এক জায়গায় বলা হয় :

> ...বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন...।[৩৪]

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব অবশ্য তাঁর ৭ মার্চের (১৯৭১) ভাষণটিকেই ইঙ্গিত করে থাকেন। ২৫ মার্চ রাতে তাঁর নামে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, এটা তিনি কখনো বলেছিলেন কি না, তা তিনি পরে আর উল্লেখ করেননি। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

> ...স্বাধীনতার ইতিহাস কোনো দিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিল তারা সবাই জানত যে ২৫ তারিখ রাতে কী ঘটবে। তাদের বলেছিলাম, আমি মরি আর বাঁচি সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ৭ মার্চ কি স্বাধীনতাসংগ্রামের কথা বলা বাকি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।[৩৫]

স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে কেন এই বিতর্ক—এই প্রশ্ন উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই। বঙ্গবন্ধু যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন এ নিয়ে কেউ বিতর্ক করেনি। এ নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ঝগড়া ছিল না। পরবর্তী সময়ে একটি গোষ্ঠী জিয়াউর রহমানকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' হিসেবে প্রচার করে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভূমিকাকে খাটো করে দেখাতে চেয়েছে। এতে জিয়া বড় হননি, শেখ মুজিবও ছোট হননি। রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে প্রতিপক্ষ দলের নেতাকে

ছোট করে দেখানোর মধ্যে অনেকেই বিকৃত আনন্দ পান। ইতিহাসে যার যার ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে আছে এবং যার যার প্রাপ্য মর্যাদা একদিন না একদিন দিতেই হয়।

রেডিওতে জিয়ার ঘোষণা ওই সময় মানুষকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। ঘোষণাটি দিয়ে তিনি কোনো অপরাধ করেননি, সাহসের কাজই করেছেন। ঘোষণার শব্দচয়ন নিয়ে যে বিভ্রান্তি বা ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল, আওয়ামী লীগ নেতাদের পরামর্শে জিয়া তাঁর ঘোষণার পরিমার্জন করে বিভ্রান্তি দূর করেছিলেন। এটিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে জিয়ার ঘোষণা শুনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি। একটি দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্বটি শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতেই। অবশ্য পুরো একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে প্রথম বিদ্রোহ করার কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানকে দিতে হবে। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, শপথ নিয়েছিলেন জয় বাংলা স্লোগান উচ্চারণ করে। এটি ইতিহাসের সত্য কথা।

# জঙ্গনামা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করে। আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানায় অবস্থিত ইপিআর হেডকোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনস। অতর্কিত আক্রমণে ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা খুব বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারেননি। হতাহত হন অনেকেই। তবে কেউ কেউ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এরপর বেসামরিক এলাকাগুলোয় আক্রমণ শুরু করে।

২৬ মার্চ শুরু হয় হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের পদযাত্রা। তাঁরা সবাই শহর ছেড়ে যাচ্ছেন। অনেকের ঠিকানা নিজ নিজ গ্রামে। যাঁদের আর কোনো ঠিকানা নেই, তাঁরা ক্রমাগত হাঁটছেন সীমান্তের দিকে। নারী-পুরুষ-যুবা-বৃদ্ধ-শিশু সবাই ছুটছেন প্রাণ হাতে নিয়ে। পেছনে পড়ে আছে অগুনতি লাশ, আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি। ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদগুলো মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানের কয়েকটি লাইন মনে করিয়ে দেয় :

> ...আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।
> লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল
> গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।
> কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি
> লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।[১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা সন্তানদের নিয়ে পাশের মোশাররফ হোসেনের (সরকারি কর্মকর্তা, পরে বিএনপির সংসদ সদস্য) বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তাঁরা শেখ মুজিবের বন্ধু পূর্ব পাকিস্তান শিপিং করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন কিউ বি এম রহমান বাশারের ধানমন্ডির ১৫ নম্বর সড়কের ফ্ল্যাটে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তাঁরা খিলগাঁওয়ের একটি বাসায় যান। কয়েক দিন পর তাঁরা মগবাজার চৌরাস্তার কাছে একটি বাসায় ওঠেন।[২]

*ইত্তেফাক*-এর প্রয়াত সম্পাদক মানিক মিয়ার পরিবারের সঙ্গে মুজিব পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। জাতীয় নিরাপত্তা সেলের প্রধান মেজর জেনারেল গোলাম উমর বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য মানিক মিয়ার ছেলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর শরণাপন্ন হন। সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মঞ্জুর আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে *ইত্তেফাক* পত্রিকার ভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট অফিসের এক কর্মকর্তাকে মঞ্জু বলেছিলেন, *ইত্তেফাক* অফিস পোড়ানো ছিল অনিচ্ছাকৃত এবং এ জন্য ক্ষমা চেয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছিল। *ইত্তেফাক*-এ জার্মানি থেকে সদ্য আনা নতুন ছাপার মেশিন বসানো হয়েছিল। এগুলো বিমা করা ছিল। মঞ্জু বিমা কোম্পানির কাছ থেকে পুরো টাকাটাই পেয়ে যান। একটি ধার করা পুরোনো ছাপাখানা থেকে তিনি দৈনিক সাড়ে সাত হাজার কপি পত্রিকা ছাপাতে থাকেন। এর ৭৫ শতাংশই সামরিক কর্তৃপক্ষ নিয়ে নিত। কনস্যুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাডের বিবরণে এসব তথ্য উঠে এসেছে।[৩]

মঞ্জুর বাসায় বেগম মুজিবের সঙ্গে জেনারেল উমরের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্জু দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন। উমর বেগম মুজিবকে বলেন, তাঁরা এখন যেখানে আছেন, তাতে কর্তৃপক্ষ খুশি নয়। কেননা এটি মোটেও নিরাপদ নয়। বিহারিদের বিক্ষোভ চলছে। কর্তৃপক্ষ চায়, তিনি যেন তাঁর নিজের বাড়িতে অথবা ধানমন্ডি কিংবা গুলশানে তাঁর পছন্দের কোনো একটি বাড়িতে থাকেন; বেগম মুজিবের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সেনা, সাদাপোশাকের নিরাপত্তারক্ষী অথবা পুলিশ দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। বেগম মুজিব ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে সেনা পাহারায় থাকার প্রস্তাব মেনে নেন। উমর তখন এর খরচ বহনের প্রস্তাব দিলে বেগম মুজিব তা নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ব্যাংকে তাঁদের টাকা আছে, কিন্তু শেখ মুজিবকে চেক সই করতে হবে। পরে তিনি মুজিবের সই করা চেক পান। এর মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে মুজিব বেঁচে আছেন।[৪]

সামরিক বাহিনীর লোকেরা বেগম মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ১২ মে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের (পরবর্তী সময়ে ৯-এ) ২৬ নম্বর বাড়িতে নিয়ে আসে।[৫] মুজিববিরোধীরা পরে প্রচার করেছিল যে সামরিক কর্তৃপক্ষের টাকায় তাঁরা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। আর্চার ব্লাডের ভাষ্যে জানা যায় যে এই প্রচার ছিল অসত্য।

২৭ মার্চ ভারতের রাজ্যসভায় 'পূর্ব বাংলার' সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। 'স্বতন্ত্র পার্টি' শেখ মুজিবুর রহমানের সমাজতন্ত্রের কর্মসূচির প্রশংসা করে। 'জনসংঘ' শেখ মুজিবের 'সেক্যুলার নীতি' সমর্থন করে বলে, পূর্ব

বাংলার মানুষ তাদের ভাই। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে আগ্রহী, কেননা আমরা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, শ্রী মুজিবুর রহমানও তার পক্ষে। মানুষ তাঁর পেছনে এবং এই মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এটি দেখে আমরা অভিভূত। সম্মানিত সদস্যদের কাছে আবেদন, এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'[৬]

ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে (রাজ্যসভা ও লোকসভা) ৩১ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে 'পূর্ব বাংলাসম্পর্কিত একটি প্রস্তাব' পাস হয়। প্রস্তাবের শেষ অংশে বলা হয়, 'পূর্ব বাংলায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের অভ্যুত্থান সফল হবে। এই সভা আশা করে এবং নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে তাদের লড়াই ও ত্যাগ ভারতের জনগণের সর্বাত্মক সহানুভূতি ও সমর্থন পাবে।'[৭]

৩০ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ আমীর-উল-ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের বিএসএফের পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদারের সহায়তায় তিনি একটি কার্গো বিমানে করে ১ এপ্রিল দিল্লি রওনা হন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও অধ্যাপক আনিসুর রহমান ১ এপ্রিল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগরতলা থেকে দিল্লিতে পৌঁছান। তাঁরা 'ত্রিপুরা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে' ওঠেন। রেহমান সোবহান দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বাসার ফোন নম্বর জোগাড় করেন। অমর্ত্য সেন আর সোবহান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। পরে সোবহান ও আনিসুর রহমান অমর্ত্য সেনের বাসায় যান। পরদিন ২ এপ্রিল অমর্ত্য সেন তাঁদের নিয়ে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অশোক মিত্রের (পরে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী) লোদি রোডের বাসায় যান। অশোক মিত্র ফোন করে প্রধানমন্ত্রীর সচিব অধ্যাপক পৃথ্বিনাথ ধরকে খবর দেন। সোবহান ও আনিসুর পি এন ধরকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং গণহত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। ধরের মনে হলো বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানানো দরকার। সন্ধ্যায় অশোক মিত্র তাঁদের দুজনকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের কাছে যান এবং হাকসারকে সব খুলে বলেন।[৮]

ওই সময় তাজউদ্দীন আহমদ ও আমীর-উল-ইসলাম দিল্লিতে আছেন, হাকসার এটি শুনেছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না। রেহমান সোবহান হাকসারকে জানালেন যে তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর খুবই আস্থাভাজন ব্যক্তি। ভারতীয়দের মনে প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কে নেতৃত্ব দেবেন। তাদের এটি বুঝতে দুদিন লেগেছিল। ৩ এপ্রিল সকালে রেহমান সোবহানের সঙ্গে তাজউদ্দীনের দেখা হয়। ওই রাতেই তাজউদ্দীনের সঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। তাজউদ্দীন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে কী পরিচয়ে নিজেকে উপস্থাপন করবেন, এটি নিয়ে কথাবার্তা হয়। রেহমান সোবহান ও আমীর-উল-ইসলাম তাজউদ্দীনকে বোঝান যে এ সময় আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না। তাঁকেই বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশের দায়িত্ব নিতে হবে। হাকসারকে ইতিমধ্যেই এ ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৯]

তাজউদ্দীন আহমদ ৩ এপ্রিল রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নয়াদিল্লির ১ নম্বর সফদরজঙ্গ রোডের বাসায় প্রথম দেখা করেন। তাজউদ্দীন আমীর-উল-ইসলামের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বাধীন বাংলার সরকার গঠন করবেন এবং তিনি নিজে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হলে তাজউদ্দীন তাঁকে সরকার গঠনের ব্যাপারে অবহিত করেন। ইন্দিরা গান্ধী এই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেননি। তবে এই প্রবাসী সরকার ভারতের ভূখণ্ডের মধ্য থেকে কার্যকলাপ চালাতে পারবে বলে জানিয়ে দেন।

দিল্লিতে থাকাকালে ৭ এপ্রিল তাজউদ্দীনের একটি বেতার ভাষণ রেকর্ড করা হয়। তাঁর দেওয়া বিষয়সূচির ওপর ভিত্তি করে ভাষণটির খসড়া তৈরি করে দেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও আমীর-উল-ইসলাম। রেহমান সোবহান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাম রাখলেন 'পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)।[১০]

তাজউদ্দীন যখন দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলছেন, সেই সময় হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় এক চা-বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন 'বিদ্রোহী' বাঙালি কর্মকর্তা একটি সভা করেন। এটিই ছিল সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তখনো সংগঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের সদস্যরা তখনো কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। সামরিক নেতৃত্বই প্রথম সংগঠিত হয়েছিল।

তত দিনে আওয়ামী লীগের যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ কলকাতায় পূর্বনির্ধারিত চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে এসে উপস্থিত। সিরাজুল আলম খান পৌঁছান দুই সপ্তাহ পরে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে তাজউদ্দীন দিল্লি গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, এটি জেনে তাঁরা খুব ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের দাবি অনুযায়ী, তাজউদ্দীনের ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল। তাঁদের ভাষ্যমতে, শেখ মুজিবের স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, এই চারজন যুবনেতার নেতৃত্বে বিপ্লবী কাউন্সিল হবে এবং কোনো ধরনের সরকার গঠন করা হবে না। বিপ্লবী

কাউন্সিল তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং দেশের ভেতরে গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করবে।[১১]

তাজউদ্দীন কলকাতায় ফিরে এলে যুবনেতাদের তোপের মুখে পড়েন। তিনি কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেন যে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়ির ঠিকানা তিনি খুঁজে পাননি। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা কামারুজ্জামান ও মিজানুর রহমান চৌধুরী কলকাতায় এসে পৌঁছান।

তাজউদ্দীন ১০ এপ্রিল আমীর-উল-ইসলাম, শেখ মণি, তোফায়েল আহমেদ ও মনসুর আলীকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। পথে শিলিগুড়িতে তাঁরা যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তাঁরা রেডিওতে তাজউদ্দীনের ভাষণ শুনতে পান। এরপর তাজউদ্দীনের সঙ্গে শেখ মণির বেশ কথা-কাটাকাটি হয়। তাজউদ্দীন কার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এ নিয়ে শেখ মণি প্রশ্ন তোলেন।[১২]

শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে তাঁরা ময়মনসিংহ সীমান্তের কাছে মেঘালয়ের তুরা শহরে সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেখা পান। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সবাই আগরতলায় যাত্রা করেন। আগরতলায় খন্দকার মোশতাক আহমদ ও কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ঠিক হয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হবে। তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি থাকবেন। খন্দকার মোশতাক প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার ছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে রাজি করানো হয়। কামারুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র এবং মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। কর্নেল ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এভাবেই গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার। বিএসএফের সহযোগিতায় ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে সীমান্তবর্তী অখ্যাত বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রবাসী সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হয়। গ্রামবাসী অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রথম দৃশ্যটি দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে অনেক সাংবাদিককে নিয়ে আসা হয়েছিল। গ্রামটির নতুন নাম দেওয়া হয় 'মুজিবনগর'। অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।[১৩]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করা নিয়ে তিন রকম তথ্য পাওয়া যায়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাজউদ্দীন যখন দিল্লিতে, তখনই এটি লেখা হয়। আমীর-উল-ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, এটির প্রাথমিক খসড়া তিনিই তৈরি করেছিলেন। পরে কলকাতার ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরী এটি পরিমার্জন করে দেন। রেহমান সোবহানের বর্ণনামতে, খসড়ার কিছু অংশ তিনি তৈরি করেছেন,

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ

বাকিটা লিখেছেন আমীর-উল-ইসলাম। ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় এটি পরিপূর্ণ রূপ পায়। উভয়েই বলেছেন, ঘোষণাপত্র লেখার সময় তাজউদ্দীনের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল।[১৪]

এ প্রসঙ্গে বিএসএফের তৎকালীন মহাপরিচালক খসরু ফারামুর্জ রুস্তমজির ভাষ্যটি ভিন্ন রকমের। তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ রেখে একটি 'সংক্ষিপ্ত সংবিধানের' খসড়া তৈরি করেন বিএসএফের মুখ্য আইন কর্মকর্তা কর্নেল এন এস বেইনস। ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরী এটি দেখে দেন। তারপর এটি তাজউদ্দীন ও তাঁর সহকর্মীদের দেখানো হলে তাঁরা সামান্য কিছু রদবদল করে এটি অনুমোদন করেন।[১৫]

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা যে যেখানে ছিলেন, সুযোগমতো তাঁরা বিদ্রোহ করেন। চট্টগ্রামে ইপিআরের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বিদ্রোহ করেন ২৫ মার্চ রাতে।[১৬] মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা ২৫ মার্চ মাঝ রাতেই বিদ্রোহ করেছিলেন। ২৬ মার্চ সকালে বিদ্রোহ করেন কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত ইপিআরের ৪ নম্বর উইংয়ের অধিনায়ক মেজর আবু

ওসমান চৌধুরী।[১৭] ২৭ মার্চ সকালে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর শাফায়াত জামিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্রোহ করেন। ওই দিন বিকেলে চতুর্থ বেঙ্গলের মেজর খালেদ মোশাররফ শমসেরনগর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে বিদ্রোহে যোগ দেন।[১৮] জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ বিদ্রোহে শামিল হন ২৯ মার্চ। যশোরে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ বিদ্রোহ করেন ৩০ মার্চ সকালে।[১৯]

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটের বাঙালি সদস্যরা যখন একে একে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছেন, তখন অষ্টম বেঙ্গলের সদস্যরা একটি ইউনিট হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করে চলেছেন। তাঁরা তখনো জানেন না, কোথায় কী হচ্ছে। ওই সময় প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেওয়া লে. সমশের মুবিন চৌধুরীর বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক :

> ইন্ডিয়ান রেডিও বলছে পূর্ব বাংলায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। রেডিও পাকিস্তানকে তো বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। ৩০ তারিখ ভোরে চকবাজারে আমরা গুলির আওয়াজ শুনেছি। এত কাছে তো পাকিস্তান আর্মি আসার কথা না! ২৯ তারিখ পাকিস্তান আর্মির একটি কমান্ডো ইউনিট ল্যান্ডেড ইন আনোয়ারা, লেড বাই মেজর মান্নান (পরে বিএনপির নেতা, মন্ত্রী)। লে. মাহফুজ যখন ফায়ার করা শুরু করল ওখানেই পাকিস্তানের কিছু লোক মারা যায়, অন দ্য স্পট। বাকি লোক পালিয়ে যায়। মান্নান পালিয়ে যায়। মাহফুজই পরে বলেছিল, 'মান্নান তো আমারে মেরেই ফেলছিল।' দুজন কমান্ডো ওখান থেকে পালিয়ে বোয়ালখালীর গ্রামে এসে ঢুকেছে, মানুষকে গুলি করে মারছে।
>
> চকবাজার থেকে বোয়ালখালী নট ভেরি ফার। আমি আমার একটা সেকশন নিয়ে এগোচ্ছি। দেখলাম দুজন পাকিস্তানি, যাকে সামনে পায় গুলি করে। আমার সঙ্গে ছিল সুবেদার খালেক। বললাম, পজিশন নিয়া থাকো। যখন রেঞ্জে আসবে, দেখামাত্র গুলি করব। তুমি একটা, আমি একটা। খালেক বলল, 'স্যার, আপনি ডান দিকে যান, আমি বাঁ দিকে যাই।' যখন রেঞ্জে এল, ওয়ান টু থ্রি বলে দুটা গুলি। দুটাই পড়ে গেল। ওয়ান ডাইড অন স্পট, ওয়ান ওয়াজ উন্ডেড। যে উন্ডেড, ওর ওপর গ্রামের মানুষ ঝাঁপায়া পড়ল। আর খুরকি দিয়া গলা, একদম শিরশ্ছেদ। চিৎকার করে বলতেছে, উগ্‌গা মরি গিয়্যে, উগ্‌গা মরি গিয়্যে। এদের রাইফেল, উইপন নিয়া নিলাম।[২০]

১১ এপ্রিল কালুরঘাটের যুদ্ধে লে. সমশের ও ক্যাপ্টেন হারুন আহত হন। দুজন ছাত্র হারুনকে প্রায় অচেতন অবস্থায় ব্রিজের ওপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে অপর পাড়ে নিয়ে আসে এবং একটি মাইক্রোবাসে করে পটিয়া পাঠিয়ে দেয়। সমশেরের পায়ে গুলি লেগেছিল। আহত অবস্থায় তিনি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী

হন।[২১] তাঁর শার্টের বুকপকেটের একটিতে সুরা ইয়াসিন লেখা কাগজ ছিল, অন্য পকেটে ছিল জিয়ার হাতের লেখা 'স্বাধীনতার ঘোষণা', যেটি তিনি ২৮ মার্চ সারা দিন ধরে পড়েছিলেন। পাকিস্তানি সেনা কাগজটি পকেট থেকে বের করে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।[২২]

পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থাকার মতো সেনা, অস্ত্র ও রসদ বাঙালি সেনাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। পিছু হটতে হটতে তাঁরা একে একে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের ভেতরে চলে যান। বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তাদের কয়েকজন ৪ এপ্রিল হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় মেজর কে এম সফিউল্লাহর অস্থায়ী দপ্তরে জমায়েত হন। সফিউল্লাহর দেওয়া বিবরণে জানা যায়:

> বিদ্রোহের পর আমরা একটি একক কমান্ডের অধীনে নিজেদের সংগঠিত করার কথা ভাবলাম। আমাদের মধ্যে তেমন কোনো সিনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন না, যিনি কমান্ড করতে পারেন। সুতরাং আমরা কর্নেল ওসমানীর কথা ভাবলাম। ৪ এপ্রিল আমার সদর দপ্তরে একটি বৈঠক হলো। বৈঠকে কর্নেল ওসমানী, লে. কর্নেল রব, লে. কর্নেল নূরুজ্জামান, খালেদ মোশাররফ, নাসিম, মইনুল হোসেন চৌধুরী, নুরুল ইসলাম শিশু এবং আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। জিয়া আসে ৫ তারিখে। সে এসেছিল আমার ব্যাটালিয়ন থেকে সেনা সংগ্রহ করতে। আমি ও খালেদ আমাদের নিজ নিজ বাহিনী থেকে এক কোম্পানি সেনা দিলাম, যাতে তারা চট্টগ্রামে অষ্টম বেঙ্গলে যোগ দিতে পারে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওসমানী হবেন আমাদের সর্বাধিনায়ক। সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় ৪ এপ্রিল। বিদ্রোহী সেনারা কোনো দিক থেকেই স্বীকৃতি পাবে না। আমরা অসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকার গঠন করতে বললাম। ১০ এপ্রিল আগরতলায় জনাব তাজউদ্দীন ও অন্যদের আমাদের সিদ্ধান্ত জানালাম (তাজউদ্দীন আগরতলায় এসেছিলেন ১১ এপ্রিল)। ওসমানীকে কমান্ডার-ইন-চিফ এবং আমাদের চারজনকে সেক্টর কমান্ডার করা হলো—জিয়া, খালেদ, আবু ওসমান চৌধুরী ও আমি।
>
> আমরা ছিলাম আঞ্চলিক কমান্ডার। পরে নাজমুল হকের নেতৃত্বে রাজশাহী এবং নওয়াজিশের অধীনে রংপুরকে নিয়ে আরও দুটি অঞ্চল হলো। ১০ থেকে ১৭ জুলাই মুজিবনগরে (কলকাতা) অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অঞ্চলগুলোকে নিয়ে ১১টি সেক্টর তৈরি হলো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হলো।[২৩]

অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা ১৮ এপ্রিল বিভিন্ন যুব শিবির থেকে যুবকদের সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ—এই চারজন যুবনেতাকে দায়িত্ব দেয়। প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী মন্ত্রিসভায় এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি

সই করেন। পরে সরকারের সঙ্গে যুবনেতাদের দূরত্ব তৈরি হয়। সরকারের মূল আপত্তি ছিল, এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, এই নিয়ে।[২৪] এই চার যুবনেতা পরে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ) নামে আলাদা একটি বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে ভারতের স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, যার ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান। বিএলএফ পরে 'মুজিববাহিনী' নামে পরিচিতি পায়।[২৫]

বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোতে অনেক বাঙালি কাজ করতেন এবং সপরিবার তাঁরা ওই দেশগুলোতে থাকতেন। তাঁরা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থানে ছিলেন। তাঁদের অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার এই উত্তাপ দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তাদের গায়ে লেগেছিল ধীরে ধীরে। তবে অনেকেই শেষ অবধি পাকিস্তান সরকারের চাকরি করে গেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে তাঁদের প্রথম 'বিদ্রোহ'টি ঘটে ৬ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে। ওই দিন পাকিস্তান হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম শাহাবুদ্দিন এবং সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদুল হক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁদের ইসলামাবাদে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেখানে যেতে অস্বীকার করেন এবং ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চান। বাংলাদেশে তখনো কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং পরিস্থিতি ছিল খুবই ঘোলাটে। এই দুই বাঙালি কর্মকর্তার 'পক্ষত্যাগ' ছিল একটা সাহসী পদক্ষেপ। ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করে।[২৬]

১৮ এপ্রিল দিনটি ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিন কলকাতায় পাকিস্তান উপহাইকমিশনের দপ্তরের তিনতলা ভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। দূতাবাস চত্বরে ছিল জনতার ভিড়। শরণার্থী বাঙালিরা উল্লাস করছিলেন। সেখানে তাঁরা শেখ মুজিব, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি দেন। উপহাইকমিশনার এম হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে গণমাধ্যমে বিবৃতি দেন। তাঁর সহকর্মী আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বিবৃতিটির খসড়া তৈরি করেছিলেন। সন্ধ্যায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোয়েন্দারা উপহাইকমিশন ভবনে এসে গুপ্তলিখনে তৈরি দলিলাদি (সাইফার ডকুমেন্ট) নিয়ে যান। বাংলাদেশ সরকার হোসেন আলীকে কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়।[২৭]

হোসেন আলীর অপ্রকাশিত ডায়েরি থেকে জানা যায়, ২০ মে সন্ধ্যায় তাঁর দূতাবাস ভবনে দুটো ট্রাক এসে ঢোকে। বাংলাদেশের ভেতরে কয়েকটি ব্যাংকের

ভল্ট ভেঙে ওই দুটো ট্রাকে করে টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল। অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং অর্থসচিব আসাদুজ্জামান জানান, এই টাকা দূতাবাসের ভেতরেই নিরাপদ থাকবে। হোসেন আলী লোহার গ্রিল ও দরজা দ্বারা সুরক্ষিত দুটো ঘরে এগুলো রাখার ব্যবস্থা করে বলেন যে, এই টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা সরকারই ঠিক করবে। ওই সময় বাংলাদেশের ভেতরে স্টেট ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে অনেকেই টাকা নিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ে হোসেন আলীর অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। তাঁর বর্ণনায় একটি ঘটনার বিবরণ জানা যায় :

> এ সময় আমি জানতে পারলাম বগুড়ায় স্টেট ব্যাংকের ভল্ট ভাঙা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট আমি পেয়েছিলাম, যার অনুলিপি এখনো আমার কাছে আছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বগুড়ার জনাব গাজীউল হক এই লুটে নেতৃত্ব দেন।
>
> পরে আমাকে বলা হলো, জনাব গাজীউল হক মাত্র এক কোটি টাকার কিছু বেশি সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছেন। তিনি *জয় বাংলা* নামে একটা পত্রিকা ছাপানোর খরচ দিচ্ছেন। জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব আবদুল মান্নান ছিলেন এর প্রকাশনার দায়িত্বে।[২৮]

বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়ায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে অনেক কথাবার্তা ও লেখাজোকা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ে এক সেমিনারে নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজের পরিচালক কৃষ্ণস্বামী সুব্রামনিয়াম ভারত সরকারের ধীরে চলা নীতির সমালোচনা করেন। ৩১ মার্চ নেহরু পরিবার ও ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক *ন্যাশনাল হেরাল্ড* পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে তিনি লেখেন, 'এটি ভারতের জন্য এমন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে, যা আগে কখনো আসেনি।' সরকারের কারও সঙ্গে আলাপ বা পরামর্শ করে তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেননি। যা বলার তা তিনি নিজ দায়িত্বেই বলেছিলেন। এরপর *ন্যাশনাল হেরাল্ড* তাঁর কোনো লেখা ছাপাতে অস্বীকার করে। সুব্রামনিয়াম পরে লেখা ছাপানোর জন্য জনসংঘ-সমর্থক পত্রিকা *মাদারল্যান্ড*-এর শরণাপন্ন হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে লিখতে তাঁকে নিষেধ করা হয়। তাঁর ইনস্টিটিউট আয়োজিত একটি রুদ্ধদ্বার সেমিনারে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে কয়েকজনকে ধরে এনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে একটি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার তৈরি হয়েছে। *লন্ডন টাইমস*-এর একজন প্রতিবেদক তাঁর এ কথা উদ্ধৃত করে সংবাদ পরিবেশন করলে তা ব্যাপক প্রচার পায়।[২৯]

বাংলাদেশ স্বাধীন করার ব্যাপারে শেখ মুজিবের মনোভাব, এ ব্যাপারে ভারতের পরিকল্পনা, কলকাতায় প্রবাসী সরকার গঠনের পটভূমি,

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভাজন—এসব বিষয়ের একটি অন্তরঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় ওই সময়ের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ডা. আবু হেনার কাছ থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে, শেখ মুজিব একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে একাত্তরের মার্চে আবু হেনাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আবু হেনা বলেন :

> আমরা জাস্টিস ইব্রাহিমের বাসায় ছোট একটা স্টাডি সার্কেল করছিলাম—কেন স্বাধীনতা দরকার। ১৯৬৪-৬৫ সালের কথা। জিরো পয়েন্টের এই মোড়ে, সেক্রেটারিয়েটের কোনায়, ওইখানে একটি পেট্রল পাম্প ছিল। ওইখানে উনার বাড়ি ছিল। স্টাডি সার্কেল থিকা উনি নেতৃত্ব দিতেন, বুদ্ধি দিতেন। উনার মেয়ের জামাই ইশতিয়াক সাহেব, কাজী আরেফ, আমি, মাজহারুল হক বাকী, ইকবাল হলের ভিপি হারুন—আমরা সবাই স্টাডি সার্কেলে বসতাম। উনি আমাদের একটা পত্রিকা বানায়া দিতে চাইছেন। বলছেন, 'গ্রিন রোডে আমার এক বিঘা জায়গা আছে। এইটা নাও, পত্রিকা বের করো। স্বাধীনতার জন্য লাগবে।'
>
> ইব্রাহিম সাহেব বলতেন, 'মুজিবের মতো বাঘের বাচ্চা ছাড়া স্বাধীনতা হবে না।' আমার সামনে বলছে ছয় দফা দেওয়ার আগে। ওরা আমাদের ছোবড়ার মতো ফেলে দিছে। দেশটা স্বাধীন করতে হবে। আমি সিরাজ ভাইয়ের (সিরাজুল আলম খান) খুব কাছের লোক। সব ঘটনার সূত্রপাত আমি জানতাম। উনাদের সঙ্গে ভারত সরকারের একটা সম্পর্ক ছিল। এই গ্রুপের সঙ্গে এখানে নেটওয়ার্কে যারা কাজ করত, তার মধ্যে রূপলাল হাউসের জমিদার, শ্যামবাজারের জমিদার—তার ছেলে—রূপা মুখার্জিরে বিয়া কইরা এখানে থাকতেছে, কালিদাস বৈদ্য। কে? একটি রাজনৈতিক দল বানাইছিল, গণমুক্তি দল। সেই দলে ছিল চিত্ত সুতার। চিত্ত সুতারের ওখানে গিয়া এদের সবার সঙ্গে পরিচয় হইছে। এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে সিরাজদের একটা সম্পর্ক ছিল। এই নেটওয়ার্কের কাজ কী ছিল? টু ডিসটার্ব ইস্ট পাকিস্তান। তারা বলত, ইস্ট পাকিস্তানে হিন্দুদের—মাইনরিটিকে অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের জন্য সেপারেট এনটিটি তৈরি করা দরকার।
>
> স্বাধীন বঙ্গভূমি বানানোর জন্য ম্যাপ তৈরি হইছিল ইন্ডিয়ায়। আমি জানি এইগুলো। মুজিব ভাই জানত। তাজউদ্দীনও জানত। আইয়ুব খান এটা জানতে পারছে, চিত্ত সুতারকে ধইরা জেলে পুরছে। জেল থেইকা মুক্ত হইলে মুজিব ভাই ডাইকা পাঠাইল, 'তুমি হিন্দু হিন্দু করতেছ, আমি বাঙালি বাঙালি করতেছি। আমার পক্ষে তুমি কাজ করো। তুমি ইন্ডিয়া চইলা যাও। চিত্ত সুতার কলকাতায় পাটের অফিস নাম দিয়া একটা বাড়িতে থাকে। ইন্ডিয়া বলছে, তুমি তো আমাদের লোক। তাদের একজন লোক দাও।'
>
> শেখ মণি একদিন আওয়ামী লীগ অফিসে বললেন, 'তোমাকে ক্যালকাটা

যাইতে হবে। একজন তরুণ নেতা, যে ইংরেজি-বাংলা জানে, হিন্দি জানে, এই টাইপের একজন। ইলেক্টেড হইলে ভালো হয়।'

উনি (মুজিব) বলতেন, 'বুড়ারা তো মন্ত্রী হইতেছে। আমি তো স্বাধীনতা চাই। আমার স্বাধীনতার সেনা হবি তোরা। ইলেক্টেড হইলেই তোরা নেতা হবি।' এই নীতি নিয়া আমরা অনেকেই নির্বাচন করছি। উনার বিশ্বাস ছিল আমাদের ওপর।

উনি (মুজিব) কেন গ্রেপ্তারবরণ করছেন, সেটার মূল্যায়ন আমার কাছে আছে। আমরা যারা স্বাধীনতার কথা বলতাম, আমিই একমাত্র ব্যক্তি, কোনো এজেন্সির সঙ্গে সম্পর্ক করি নাই। আমি যেহেতু আলোচনা করছি—রেডিও স্টেশন দিছে, বর্ডার উন্মুক্ত করে দিছে, শেল্টার দিছে। কিছু অস্ত্রশস্ত্র চাইছিলাম। অস্ত্রগুলো সিরাজুল আলম খান আর শেখ ফজলুল হক মণি নিয়া আসবে। কিন্তু সেগুলো তারা দেয় নাই। তাজউদ্দীন সাহেব যে ডিক্লারেশন দিছে, পরিস্থিতির কারণে সবাইকে তা অ্যাকসেপ্ট করতে হইছে।

দশজন লোক দিয়া মুজিববাহিনী বানাবে, ভাসানী দশজন লোক দিয়া আরেকটা বানাবে, মোজাফফর একটা বানাবে, কেন এই সুযোগ দিবেন? আমরাই তো সব। তরুণ সমাজকে আমরাই তো নেতৃত্ব দেব।[৩০]

২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণের অভিঘাত সরাসরি ভারতের ওপর পড়েছিল। কিন্তু 'বাংলাদেশ' পরিস্থিতি ভারতের নজরদারিতে ছিল আগে থেকেই। 'পাকিস্তান' নিয়ে তাদের অন্য রকম হিসাব-নিকাশ ছিল। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW-রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং) তৈরি হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। এর প্রথম প্রকল্পটির নাম 'বাংলাদেশ'।[৩১]

১ মার্চ বাংলাদেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়লে ভারত সরকার তা ভালোভাবেই নজরে আনে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২ মার্চ তাঁর সবচেয়ে দক্ষ দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এ দুজন হলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসার এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সচিব রামেশ্বর নাথ কাও। কাও একই সঙ্গে ছিলেন র-এর প্রধান। ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের 'বাংলাদেশকে সাহায্য' করার ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে এবং 'স্বাধীন বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দেওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন।[৩২]

ইন্দিরা গান্ধী ধরেই নিয়েছিলেন, বাংলাদেশ নিয়ে একটা যুদ্ধ হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব-ফার্জ-রাফায়েল জ্যাকব এপ্রিলের শুরুতেই ইন্দিরার কাছ থেকে অভিযানের নির্দেশ পেয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল স্যাম হরমুসজি ফ্রামজি জামশেদজি মানেকশ টেলিফোনে জেনারেল জ্যাকবকে আক্রমণ শুরু

করতে বলেছিলেন। কিন্তু জ্যাকব আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে, ওই সময়ের পরিস্থিতি যুদ্ধের জন্য অনুকূল ছিল না। জ্যাকব মানেকশকে বলেছিলেন, 'অসম্ভব। আমাদের পার্বত্য ডিভিশনগুলোতে পর্যাপ্ত যানবাহন নেই, নেই কোনো সেতু।' বাংলাদেশের নদী ও জলাভূমিগুলো ছিল অভিযানের জন্য বড় বাধা। জেনারেলরা ইন্দিরাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, একটু অপেক্ষা করতেই হবে। জ্যাকবের ভাষ্য অনুযায়ী :

> অনেক খরস্রোতা নদী পেরোতে হবে। বর্ষাকাল শুরু হতে যাচ্ছে। আমাদের সেতু দরকার, প্রশিক্ষণের জন্য সময় দরকার। আমি এটি মানেকশকে বললাম। আমি একটা রিপোর্টও পাঠালাম। তিনি এটি মিসেস গান্ধীকে পড়ে শোনালেন। মানেকশ জানতে চাইলেন, নিদেনপক্ষে কখন আমি যুদ্ধ শুরু করতে পারি। আমি বললাম, ১৫ নভেম্বর। মিসেস গান্ধী এখনই অভিযান শুরু করতে চান। আমার বার্তাটি তাঁকে জানানো হলে তিনি এটি মেনে নেন।[৩৩]

২৫ এপ্রিল মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী আশু সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। কয়েকজন মন্ত্রী তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন এবং 'নিষ্ক্রিয়তার' জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভার বৈঠকে জেনারেল মানেকশকে ডেকে আনেন, যাতে উপস্থিত সবাই বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে 'সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি' কী, তা জানতে পারেন।[৩৪]

ওই সময়ের একটি বিবরণ জেনারেল মানেকশর কাছ থেকেও পাওয়া যায়। মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো একটি তারবার্তা হাতে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ইন্দিরার সঙ্গে মানেকশর কথোপকথন ছিল এ রকম :

> ইন্দিরা : আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?
>
> মানেকশ : আমাকে কী করতে বলেন?
>
> ইন্দিরা : পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ুন।
>
> মানেকশ : এর অর্থ হবে যুদ্ধ।
>
> ইন্দিরা : আমি জানি। তাতে কিছু এসে যায় না।
>
> মানেকশ : বাইবেলে আছে, ঈশ্বর বলছেন, 'আলো আসুক, অমনি আলোকিত হলো।' 'যুদ্ধ হোক' এটি বললেই কি যুদ্ধ হবে? যুদ্ধের জন্য আপনি কি তৈরি? আমি তৈরি না। তার পরও আমাকে যদি এগোতে বলেন, আমি আপনাকে পরাজয়ের শতভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমাকে ছয় মাসের সময় দিন, আমি জয়ের শতভাগ নিশ্চয়তা দেব।
>
> ইন্দিরা : ধন্যবাদ। আমি আপনাকে জয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।[৩৫]

৭ মে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার সভায় ইন্দিরা বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধটা যদি ছয় থেকে আট মাস চলে, তাহলে পাকিস্তান এই বোঝা আর বইতে পারবে না। এই মুহূর্তে সামরিক অভিযান চালানো ঠিক হবে না।[৩৬]

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা চুপচাপ বসে ছিল না। আসন্ন একটি ঝড় মোকাবিলার জন্য তৈরি হচ্ছিল তারা। ২৫ মার্চের পরপর ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীর জন্য জরুরি সাহায্যের ব্যাপারে আলোচনা করতে পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান খানকে চীনে পাঠিয়েছিলেন। পথে তাঁরা ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেন। সুলতান খানের বর্ণনায় ২৫ মার্চের 'ক্র্যাকডাউনের' পরবর্তী অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর মতে, শ্রীলঙ্কা হয়ে ঢাকার পথে এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক সফর। বিমানে আধা সামরিক বাহিনীর পাঠান সদস্যরাও যাচ্ছিল। এটি তাদের প্রথম বিমানে ওড়া। তারা সবাই ছিল সন্ত্রস্ত। গুল হাসান নিজেও পাঠান। তিনি ইন্টারকমে তাদের সঙ্গে পশতু ভাষায় কথা বলেন। সুলতান খানের বর্ণনা মতে :

> ঢাকার কাছাকাছি যেতেই দেখলাম সুনসান নীরবতা আর ধ্বংসের চিহ্ন। বুড়িগঙ্গা নদীতে সব সময় নৌকার ভিড় থাকে। আজ শুধু একটি নৌকা দেখলাম। যত দূর চোখ যায়, কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। বেশির ভাগ ঘরবাড়ি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সেনাপ্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ

> পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরের দৃশ্য যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দিল। পিআইএর লোকেরাই ছিল একমাত্র অসামরিক ব্যক্তি। বিমানবন্দরে অস্ত্র মজুত করা ছিল। সেনারা লাফিয়ে নামল, তারপর অস্ত্র হাতে নিয়ে ট্রাকে উঠল। পরিস্থিতি মনে হলো হতাশাজনক। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসার সরকারি দাবি নিয়ে সন্দেহ হলো। ঢাকা বিমানবন্দরের অবস্থা সার্বিক পরিস্থিতির একটি নমুনা মাত্র।
>
> জেনারেল মিঠা আমাদের কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে গেলেন। আমরা জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করলাম। দেয়ালে ঝোলানো মানচিত্র দেখিয়ে তিনি বললেন, একদল সেনা পথের সব বাধা সরিয়ে যশোরের দিকে যাচ্ছে। একদল যাচ্ছে চট্টগ্রামের দিকে, ওখানে জোর প্রতিরোধের আশঙ্কা করছি। আরেক দল যাচ্ছে দিনাজপুরের দিকে। এই দল কিছু প্রতিরোধের মুখে পড়লেও দুষ্কৃতকারীদের সব বাধা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।
>
> আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। নিজেদের পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য কোনো সেনাপতির ভাষা এটি নয়। একটি অভ্যুত্থান দমন করার ভাষা এটি। তিনি স্বীকার করলেন, এখানকার মানুষ খুবই বৈরী এবং তাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না।[৩৭]

পাকিস্তান থেকে পিআইএর বিমানযোগে ঢাকায় সেনা পাঠানো আবার শুরু হলো। ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পর দুই ডিভিশন সেনা পাঠানো হয়।[৩৮]

পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান ও সিজিএস জেনারেল গুল হাসান ৯ এপ্রিল বেইজিংয়ে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের পক্ষে চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন আদায় করা। চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তাঁদের কয়েক দফা কথাবার্তা হয়। ইয়াহিয়া খান মার্চের শেষ সপ্তাহে চীনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এর জবাব না পেয়ে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। চিঠির প্রসঙ্গ তুলতেই চৌ বললেন, চীনারা তাড়াহুড়ো করে কিছু করে না। এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাইরের কেউ নাক গলানোর সুযোগ পেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে 'টালমাটাল' বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, তিনি দুই সপ্তাহ ধরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। সংকট না বাড়লে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত হয়তো হস্তক্ষেপ করবে না। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উচিত হবে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকা। চৌ এন লাইকে বিষণ্ন মনে হচ্ছিল। তিনি মন্তব্য করলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তিনি জানেন না কীভাবে এর মোকাবিলা করা যাবে। তবে সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো এই মানসিক দূরত্বকে গভীরতর করেছে।

চীনের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে চৌ বলেন, সামরিক কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে

রাজনৈতিক পদক্ষেপও নেওয়া দরকার। দেশপ্রেমিকদের খুঁজে বের করতে হবে, তাদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে এবং আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, 'প্রেসিডেন্টকে বলুন সেনাবাহিনীকে কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে, দৃশ্যমান অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিতে এবং রাজনৈতিক কাজ শুরু করতে। চীন অন্য কাউকে উপদেশ দেয় না। কারণ এতে ভুল-বোঝাবুঝি হয়। যেহেতু প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া) পরামর্শ চেয়েছেন, চীন পাকিস্তানকে বন্ধু মনে করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগ নিয়ে চীনের দুশ্চিন্তা আছে, তাই আমি এসব বলছি।' পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ব্যাপারে তিনি শঙ্কা জানান এবং বলপ্রয়োগের নীতি বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। চৌ ব্যক্তিগত আলাপে এসব কথা বললেও আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে 'পাকিস্তানের ঐক্যের' পক্ষে সমর্থন এবং 'বাইরের হস্তক্ষেপের' নিন্দা জানিয়েছিলেন।[৩৯]

মওলানা ভাসানীকে নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। তথাপি তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিলেন। ৩ এপ্রিল সেনাবাহিনী টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করে। পরদিন তারা ভাসানীর খোঁজে সন্তোষে যায় এবং তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় ভাসানী দুই মাইল দূরে বিন্যাফৈর গ্রামে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি নদীপথে সিরাজগঞ্জে চলে যান। ৬ এপ্রিল তিনি জরুরি কারণে বিন্যাফৈর গ্রামে আবার আসেন। পরে একটি নৌকা নিয়ে তিনি আসামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিরাজগঞ্জের ন্যাপ (মোজাফফর) নেতা সাইফুল ইসলাম এবং আরেকজন কর্মী মুরাদউজ্জামান।

ভাসানীর ইচ্ছা ছিল ভারত হয়ে লন্ডনে যাওয়ার, লন্ডন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালানো। ভারতে আসার ব্যাপারে তিনি তাঁর দলের কারও সঙ্গে আলাপ করেননি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, দলের নেতারা তাঁকে চাপ দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি আদায় করবে এবং পরে হয়তো তাঁকে চীনে পাঠিয়ে দেবে।[৪০]

২৩ এপ্রিল ভাসানীর একটি বিবৃতি *আনন্দবাজার পত্রিকার* প্রথম পাতায় ছাপা হয়। একই দিন তিনি মাও সেতুং, চৌ এন লাই ও রিচার্ড নিক্সনের কাছে ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান জানান।[৪১]

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভাসানীর আর লন্ডনে যাওয়া হয়নি। তাঁকে কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় পার্ক স্ট্রিটে কোহিনূর প্যালেসের পঞ্চম তলার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন তাঁর দুই সঙ্গীসহ তাঁকে গুরুসদয় দত্ত রোডের

গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নেওয়া হয়।[৪২] ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের গোয়েন্দা নজরদারিতে ছিলেন। যদিও তাঁকে একজন জাতীয় নেতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাঁর চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না।

সেক্টর কমান্ডাররা যাঁর যাঁর মতন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তার সুযোগও ছিল না। কর্নেল ওসমানী নয় মাসের যুদ্ধকালে সম্ভবত মাত্র ১০ দিন সদর দপ্তরের বাইরে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে লেখক মঈদুল হাসানের পর্যবেক্ষণ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> তিনি (ওসমানী) সেক্টরগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখলেন। সেক্টর কমান্ডাররা নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশে, একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে ওয়ারলর্ড বা সেনানায়কসুলভ আত্মগরিমায়। তাঁরা রাজনীতিবিদদের কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ববোধের অভাব দেখে তাঁদের অশ্রদ্ধা করতে শেখেন। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অশ্রদ্ধাজনিত কথা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের মুখে আমি এবং আরও অনেকেই ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালে শুনেছি।[৪৩]

৩০-৩১ মে কলকাতার বেলেঘাটার একটি স্কুলে প্রবাসী বাম (পিকিংপন্থী) রাজনীতিকদের দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলন বরদা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। ভাসানী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন না। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাইফ-উদ-দাহার, মারুফ হোসেন, কাজী জাফর আহমদ, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, অমল সেন, নজরুল ইসলাম, শান্তি সেন, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, মোস্তফা জামাল হায়দার, নাসিম আলী প্রমুখ। সমন্বয় কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদার), কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার গ্রুপ), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন। ভাসানী সমন্বয় কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে পাঁচদলীয় উপদেষ্টা কমিটিকে আরও বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাতে রাজি হয়নি।[৪৪]

ভাসানী-ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মসিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া) কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেন। তিনি টাওয়ার লজে উঠেছিলেন। ভাসানী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান।

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের একটি পোস্টার

তাঁর ধারণা ছিল, যাদু মিয়া তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।[৪৫]

বামপন্থীদের ব্যাপারে প্রবাসী সরকারের উৎকণ্ঠা ছিল। অভিযোগ ছিল বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থী, বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিএলএফ (মুজিববাহিনী) নেতারাও সতর্ক ছিলেন, যাতে বামপন্থীরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র হাতে না পায়। এ প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম (জুন মাস থেকে ১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক) তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন :

> ভারতীয় এলাকায় শ্রীনগর ফাঁড়ির কাছে (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শুভপুর সেতুর অদূরে) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) ব্যারিস্টার আফসার স্থানীয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ছোট একটি ট্রেনিং ক্যাম্প

> খুলেছিলেন।...একটি জাতির জীবনে এমন ভয়াবহ দুর্যোগের মুহূর্তে কোন মুক্তিযোদ্ধা কোন পন্থী এটি নিয়েও প্রশ্ন উঠবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি।...কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি আমাদের এই সরলতাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং রাজনীতিতে আমাদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়।...ক্যাম্পটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে সক্ষম এটা অনুধাবন করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চাপের কারণে ভারত সরকার ক্যাম্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।[৪৬]

'মুজিববাহিনী' নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। বিষয়টি উঠে এসেছে তৎকালীন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র নেতা কাজী জাফর আহমদের বিবরণে :

> যুদ্ধ চলাকালে বেশ কয়েকবার আমার সঙ্গে বাঙালি সামরিক অফিসারদের, বিশেষ করে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর আবুল মঞ্জুরের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাকালে আমি তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিক্ষোভ লক্ষ করেছি। মুজিববাহিনী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।...কলকাতার একটি হোটেলে আমার সঙ্গে আলোচনা হয় মুজিববাহিনীর দুই নেতা এবং আমার এককালীন বন্ধু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের। মুজিববাহিনী গঠনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেছিলেন, 'আমরা নিশ্চিত নই যে মুজিব বেঁচে আছেন কি না, কিংবা তিনি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন কি না। যদি না আসেন তাহলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তার জন্যই মুজিববাহিনী—যাতে (পরিহাসছলে) তোমরা কিংবা সামরিক বাহিনীর কোনো বাঙালি অফিসার সে শূন্যতার সুযোগ নিতে না পারো।' তাঁদের বক্তব্যে বোঝা গিয়েছিল যে তাঁরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোনো কোনো কমান্ডার সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় ও আশঙ্কায় আছেন।[৪৭]

পূর্বাঞ্চলে বিএলএফের (মুজিববাহিনী) জন্য সদস্য রিক্রুটের দায়িত্ব পালনের সময় ওই অঞ্চলের সংগঠক আ স ম আবদুর রবের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, সেক্টর কমান্ডারদের কেউ কেউ মুজিববাহিনীর বিরোধিতা করেছেন। জিয়াউর রহমান তখন ত্রিপুরার হরিণা ক্যাম্পে ছিলেন। রব প্রায়ই সেই ক্যাম্পে যেতেন এবং ২০-৩০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে আসতেন। জিয়া এটি পছন্দ করতেন না। এ নিয়ে একটি মীমাংসার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান এবং ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম রবকে একবার হরিণা ক্যাম্পে নিয়ে যান জিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য। ক্যাম্পে আটটি তাঁবু ছিল। জিয়া তার একটিতে থাকতেন, অন্য একটি ছিল হান্নানের। রব হান্নানের তাঁবুতে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও জিয়ার দেখা পাননি। জিয়ার সঙ্গে রবের কখনোই দেখা হয়নি।[৪৮]

ভারতে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাদের অন্যতম ছিলেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। তাঁর মূল কাজ ছিল মাঝেমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে তরুণদের মনোবল চাঙা রাখার জন্য বক্তব্য দেওয়া। তিনি লক্ষ করলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বেশ কিছু কর্মকর্তা উসকানিমূলক কথাবার্তা বলেন। সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে বেশ টানাপোড়েন আছে, এটি তিনি বুঝতে পারলেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত করা হলো :

> পলিটিক্যাল মোটিভেটর হিসেবে একবার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প আগরতলার মেলাঘরে যাই। সেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৫ শতাধিক জওয়ান অবস্থান করছিল। দুপুরে খাওয়ার পর জওয়ানদের সামনে আমাদের বক্তৃতা করার কথা। মেজর খালেদ মোশাররফ সেক্টর কমান্ডার—তিনি আমাদের উপস্থিতিতে জওয়ানদের উসকিয়ে দিলেন। বললেন, 'জিজ্ঞেস করো, আওয়ামী লীগ নেতারা তোমাদের জন্য কী করেছেন?' কাউকে বক্তৃতা করতে না দিয়ে আমি জবাব দিলাম, ভুলে যাবেন না আপনারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য হয়েও ভারতে স্বাধীনভাবে অবস্থান করছেন। আপনাদের খাওয়া-পরা, অনুশীলন, প্রশিক্ষণ, এমনকি দেশের অভ্যন্তরে আপনাদের পরিবারের কাছে বেতনের টাকাও পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনাদের এ-যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগ সরকার, অর্থাৎ আমরা। অন্যথায় ভারতের মাটিতে আপনাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আটক করা হতো। এ সময় আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল, সংসদ সদস্য নুরুল হক, ক্যাপ্টেন সুজাত আলীসহ অন্য নেতারাও ছিলেন।
>
> সে সময় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি (সেনা কর্মকর্তাদের) একটি বিরূপ মনোভাব ছিল। তারা বলতে চাইত, সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ নেতারা আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছেন। দলীয় এমপিদের অধিকাংশই যুদ্ধের খাতায় নাম না লিখিয়ে ক্যাম্পে অবস্থান করছেন অথবা পলিটিক্যাল মোটিভেশনের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাদের।
>
> আমার মতে, তাদের এ মানসিকতার দুটি কারণ ছিল। এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ট্রেনিংয়ের সময় যে মোটিভেশন করা হতো, তাতে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো যে বেসামরিক আমলা এবং দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক, অর্থাৎ 'ব্লাডি সিভিলিয়ান' ও 'করাপটেড পলিটিশিয়ানরাই' সবকিছুর জন্য দায়ী। এই মগজ ধোলাইয়ের কারণে পাকিস্তানি ট্রেনিংপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের মধ্যে সব সময়ই সিভিল সমাজকে খাটো করে দেখার একটি প্রবণতা কাজ করত।...
>
> দ্বিতীয়ত, সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সে সময় যাঁদের পরিবার দেশে রয়ে গিয়েছিল, তাঁদের অনেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও মানসিক ভারাসাম্য হারিয়ে

ফেলেছিলেন। তবে জিয়াউর রহমান যেমনটি চেপে রাখতে পারতেন, তেমনটি অন্যরা পারতেন না। জিয়া কেবল একদিন ত্রিপুরার সাবরুমে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় একপর্যায়ে পরিবার-পরিজনদের কথা উঠলে চোখের পানি ফেলেছিলেন। তাহলেও তাঁদের ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অহংবোধ ছিল এবং তাঁরা ভাবতেন, দেশ পরিচালনার জন্য সবার চেয়ে তাঁরাই যোগ্য।[৪৯]

মুজিবনগর সরকারের মধ্যে মতবিরোধ ও দলাদলি ছিল। এ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী তাঁর সচিব সাইফুল ইসলামকে বলেছিলেন :

> কী আর বইলবার চাব। মন্ত্রিসভার কেউ কাউকে মানে নাকি? নজরুল, মনসুর আলী, মোশতাক কেডা ছোট, কেডা বড়? তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী, খুশি কেউ না। মুজিবুর থাইকলে এ সমস্যা দাঁড়াইত না। আওয়ামী লীগের ভেতরকার কোন্দলে বহুত ক্ষতি হইব।[৫০]

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ওই সময় সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য তৈরি ছিলেন অনেকেই। এর পাশাপাশি ভিন্ন ছবিও পাওয়া যায়। এ ধরনের একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তা কামাল লোহানীর বক্তব্য থেকে জানা যায় :

> আমাদের সঙ্গে কর্মরত বন্ধুদের যাঁরা রেডিও পাকিস্তান থেকে এসেছেন, তাঁরা একসময় স্বাধীন বাংলা বেতারেরও পদমর্যাদা এবং বেতন দাবি করে বসলেন। সরকারের কাছে এ দাবি উপস্থাপন করে তাঁরা তিন দিন ধর্মঘট, অর্থাৎ কর্মবিরতি পালন করেছিলেন।...যেকোনো বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এই আচরণের জন্য কারও কোনো দণ্ড হয়নি।[৫১]

এপ্রিলে ভারতে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো এবং মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। একই সময় ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার 'পূর্ব পাকিস্তানে' নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য একের পর এক সামরিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিচ্ছিল। এই সময়জুড়ে প্রবাসী সরকারের মধ্যেও দেখা গেল নানান মত, নানান পথ, নানান ঝোঁক এবং নানান প্রবণতা।

আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত হোসেন খানের সভাপতিত্বে খন্দকার মোশতাক আহমদ, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ আবদুল আজিজের সমর্থকদের এক অনানুষ্ঠানিক সভায় তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৫২] মিজানুর রহমান চৌধুরী সরকারের ভেতরের কোন্দল সম্পর্কে বলেন :

মন্ত্রণালয়ের দপ্তর পাওয়া নিয়ে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনেক কষ্টে সমাধান করা হয়। বিশেষ করে মোশতাক ভাইকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা নিয়ে মন-কষাকষি ছিল। যদিও মোশতাক ভাইকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর জেদের কারণেই করা হয়েছিল। এমনকি প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়েও নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ভেতরে ভেতরে মোশতাক ভাই ও হেনা ভাই (কামারুজ্জামান) চাননি যে তাজউদ্দীন ভাই প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁরা উভয়েই আশা করেছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হবেন। শেষ পর্যন্ত হেনা ভাইকে অতি কষ্টে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে সম্মত করাই।[৫৩]

নেতাদের মধ্যকার টানাপোড়েন সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আবদুল আজিজের একটি ভাষ্য পাওয়া যায়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ায় মিজানুর রহমান চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। দায়িত্ব পেয়েই মিজান চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কর্মস্থল কলকাতা ছেড়ে আগরতলা, দিল্লি প্রভৃতি শহরে গিয়ে সংগঠন-বহির্ভূত কাজে জড়িয়ে পড়েন। কংগ্রেস সরকারের বিরোধী জনসংঘ নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ির সঙ্গে মিলে তিনি দিল্লিতে জনসভা করেছিলেন। বিষয়টি জেনে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষুব্ধ হন এবং মিজান চৌধুরীকে ভারত থেকে বহিষ্কারের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেন। মিজান চৌধুরী বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে শেখ আবদুল আজিজের শরণাপন্ন হন। তাজউদ্দীন মিজান চৌধুরীকে অব্যাহতি দিয়ে আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেন।[৫৪]

পাকিস্তানের 'অখণ্ডতা ও সংহতি' বজায় রাখা এবং 'সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ রক্ষার জন্য' ১৬ এপ্রিল সরকারিভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' তৈরি করা হয়। ঢাকায় ১১৬ নম্বর বড় মগবাজার ছিল শান্তি কমিটির প্রধান অফিস। কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন খাজা খয়েরুদ্দিন (আহ্বায়ক), মাওলানা নুরুজ্জামান (প্রচার সম্পাদক), নুরুল হক (দপ্তর সম্পাদক) এবং এ কিউ এম শরীফুল ইসলাম (কোষাধ্যক্ষ)। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে আরও ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম, মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, আবুল কাশেম, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম, আবদুল মতিন, আবদুল খালেক, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া), এ এস এম সোলায়মান, এ কে রফিকুল হোসেন, আতাউল হক খান, তোয়াহা বিন হাবিব, মেজর আফসারউদ্দিন, ইয়াহিয়া বাওয়ানী, হাকিম ইরতিজাউর রহমান আকুন-জাদা, সাত্তার কারওয়াদিয়া, আবু আহমদ শাহ ও মোহাম্মদ ভাই।[৫৫]

# বিজ্ঞপ্তি

সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশানুসারে সকল পলাতক ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল, পুলিশ বাহিনীর কর্মচারী ও অন্যান্য দুস্কৃতিকারীগণকে অবিলম্বে অস্ত্র-সস্ত্রসহ বা বিনা অস্ত্র-সস্ত্রে নিকটবর্ত্তী সামরিক আইন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে। তাহারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলে সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিবেচিত হইবেন। অন্যথায় তাহাদের এবং তাহাদের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে সামরিক আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সাব এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মার্শাল ল
গোপালগঞ্জ।

---

সামরিক আইন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে গোপালগঞ্জ মহকুমা প্রচার দফতর কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ফরিদপুর ওরিয়েন্টাল প্রেসে মুদ্রিত।

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি

২৬ মার্চের বেতার ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। ৭ আগস্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ৭৯ জনের সদস্যপদ বাতিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯ আগস্ট প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের ১৯৪ জনের সদস্যপদ বাতিল করা হয়।[৫৬]

ভারতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলছিল ভারত সরকারের নানান পরিকল্পনা ও দূতিয়ালি। বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমে 'বাংলাদেশ' সংবাদ শিরোনাম হচ্ছিল। একটি বিষয় গণমাধ্যমে বিশেষ করে প্রচার পাচ্ছিল। আর তা হলো, পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতন, হত্যা এবং অসংখ্য

উদ্বাস্তুর সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া। এই প্রচারের সূত্রপাত ঘটান ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটের প্রধান আর্চার ব্লাড। তিনি ২৮ মার্চ ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে 'সিলেকটিভ জেনোসাইড' শিরোনামে কয়েকটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ব্লাড এ প্রসঙ্গে বলেন :

> যদ্দুর জানি, প্রথমবার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হতাশা ও ক্ষোভ থেকেই বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল। যারা নৃশংস সামরিক অভিযানের শিকার, তিন দিন ধরে আমরা ওয়াশিংটন আর ইসলামাবাদে তাদের সম্পর্কে তথ্য পাঠিয়েছি। কিন্তু জবাবে পেয়েছি শুধু নীরবতা।[৫৭]

মার্কিন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে আর্চার ব্লাড ৬ এপ্রিল ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে আরেকটি তারবার্তা পাঠান। কনস্যুলেটের কূটনীতিকসহ উন্নয়ন ও তথ্য বিভাগের ২০ জন মার্কিন কর্মকর্তার সই করা এই তারবার্তা 'ব্লাড টেলিগ্রাম' নামে পরিচিতি পায়। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল রাজনৈতিক সমাধান। কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের পরামর্শে পররাষ্ট্র দপ্তর নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৮]

১৩ জুন লন্ডনের *দ্য সানডে টাইমস* করাচির দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এর সহকারী সম্পাদক এন্থনি মাসকারেনহাসের একটা প্রতিবেদন ছাপে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যার বিবরণ ছাপা হয়। খবরটি পশ্চিমা বিশ্বে হইচই ফেলে দেয়। মাসকারেনহাসের এই প্রতিবেদন পাঠানোর পটভূমি জানা যায় সাংবাদিক আমানউল্লাহর বর্ণনায় :

> টনি (এন্থনি মাসকারেনহাস) এসেছে, ক্র্যাকডাউনের ঠিক পরপর। সঙ্গে আলতাফ জাওয়ারসহ আরও তিন-চারজন পাকিস্তানি সাংবাদিক। আলতাফ এপিপিতে আমার সিনিয়র ছিল। সে এসেই আমাকে খোঁজ করেছে। আমি তো তখন চাকরিতে নাই। ডেনজারাস টাইম। ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেছি। পুরোনো বন্ধু-টন্ধু যদি আসে পাকিস্তান থেকে, দেখা হবে। গিয়ে দেখি ওদের। আলতাফ বলে, 'আরে ইয়ার উই আর লুকিং ফর ইউ, ক্যায়সা হ্যায় তুম?' টনি আমাকে দেখে বলে যে, 'আমান, ভেরি গুড, উই আর হিয়ার। উইথ হুম ইউ আর ওয়ার্কিং?' আমি ওকে বললাম, দেখো, আমি একজন সাংবাদিক। কিন্তু আমি একজন বাঙালিও। এখন কাজ করা একেবারেই নিরাপদ নয়, সে জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছি। বন্ধু হিসেবে তোমাদের দেখতে এসেছি।
>
> একজন বোকার মতো বলেছে, 'হামলোগকো লে চলো।' বললাম, এ কেমন কথা? তোমাদের সঙ্গে গিয়ে আমি কি বিপদে পড়ব? শেষকালে রাজি হলাম। ওরা খুব ইনসিস্ট করছে যে, কোন কোন জায়গায় কী হয়েছে, সেখানে নিয়ে যেতে। মোহাম্মদপুরের ওই দিকে, রায়েরবাজার।
>
> একটা ট্রাক নিয়েছে। বললাম, আমি ট্রাকের মেঝেতে বসব, যাতে বাইরে থেকে আমাকে কেউ না দেখে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, যা-ই লেখো, আমার নাম

37 POL 1 PAK-US

Department of State **TELEGRAM**

CONFIDENTIAL 084

Dacca 1138 4-6-71

PAGE 01 DACCA 01138 061008Z

21
ACTION NEA-08

INFO OCT-01 SS-20 AID-12 USIE-00 NSC-10 NSCE-00 CIAE-00
INR-07 SSO-00 RSR-01 RSC-01 /060 W
092431

P 060730Z APR 71
FM AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 3124
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO AMCONSUL KARACHI
AMCONSUL LAHORE

C O N F I D E N T I A L DACCA 1138
LIMDIS
SUBJ DISSENT FROM U.S. POLICY TOWARD EAST PAKISTAN

JOINT STATE/AID/USIS MESSAGE

1. AWARE OF THE TASK FORCE PROPOSALS ON "OPENESS" IN
THE FOREIGN SERVICE, AND WITH THE CONVICTION THAT U.S.
POLICY RELATED TO RECENT DEVELOPMENTS IN EAST PAKISTAN
SERVES NEITHER OUR MORAL INTERESTS BROADLY DEFINED NOR
OUR NATIONAL INTERESTS NARROWLY DEFINED, NUMEROUS OFFICERS
OF AMCONGEN DACCA, USAID DACCA AND USIS DACCA CONSIDER
IT THEIR DUTY TO REGISTER STRONG DISSENT WITH FUNDAMENTAL
ASPECTS OF THIS POLICY. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO
DENOUNCE THE SUPPRESSION OF DEMOCRACY. OUR GOVERNMENT
HAS FAILED TO DENOUNCE ATROCITIES. OUR GOVERNMENT HAS
FAILED TO TAKE FORCEFUL MEASURES TO PROTECT ITS CITIZENS
WHILE AT THE SAME TIME BENDING OVER BACKWARDS TO PLACATE
THE WEST PAK DOMINATED GOVERNMENT AND TO LESSEN LIKELY
AND DERSERVEDLY NEGATIVE INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS
IMPACT AGAINST THEM. OUR GOVERNMENT HAS EVIDENCED WHAT
MANY WILL CONSIDER MORAL BANKRUPTCY, IRONICALLY AT A
TIME WHEN THE USSR SENT PRESIDENT YAHYA A MESSAGE DEFEND-
ING DEMOCRACY, CONDEMNING ARREST OF LEADER OF DEMOCRATI-
CALLY ELECTED MAJORITY PARTY (INCIDENTALLY PRO-WEST) AND
CALLING FOR END TO REPRESSIVE MEASURES AND BLOODSHED.
IN OUR MOST RECENT POLICY PAPER FOR PAKISTAN, OUR IN-
TERESTS IN PAKISTAN WERE DEFINED AS PRIMARILY HUMANI-

CONFIDENTIAL

'ব্লাড টেলিগ্রাম'খ্যাত আর্চার ব্লাডের তারবার্তার প্রথম পৃষ্ঠা, যা ৬ এপ্রিল ঢাকা থেকে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল

> উল্লেখ করবে না। বলে, 'ইয়েস।' তারপর ওই রায়েরবাজার আর কোন কোন জায়গায় গেছি। টনির রিপোর্টে কোথাও আমার কথা বলেনি। সে কথা রেখেছিল। আমি ওদের সঙ্গে ট্রাকের ফ্লোরে বসা ছিলাম, যাতে বাইরে থেকে কেউ না দেখে।[৫৯]

বাংলাদেশ থেকে বানের জলের মতো শরণার্থী ভারতে ঢুকছিল। জুন মাসে গড়ে প্রতিদিন ১ লাখ ৫৪ হাজার বাঙালি উদ্বাস্তু সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছিল। জুলাই

মাসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় দৈনিক ২১ হাজার। ২৪ মে নিক্সনকে লেখা চিঠিতে ইয়াহিয়া অনুযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানবিক সমস্যাকে পুঁজি করার কোনো যুক্তি নেই। ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের ছুতো খুঁজছে। ২৮ জুন এক ভাষণে ইয়াহিয়া শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, একটি নতুন সংবিধান এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নতুন একটি সরকার গঠন করা হবে।[৬০]

ইয়াহিয়া খান ১২ আগস্ট ডা. আবদুল মোতালেব মালেককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ডা. মালেক একটি অসামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় ছিলেন আবুল কাসেম ও নওয়াজেশ আহমাদ (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), আখতারউদ্দিন আহমদ (কনভেনশন মুসলিম লীগ), মুজিবুর রহমান (কাইয়ুম-সবুর মুসলিম লীগ), আব্বাস আলী খান ও এ কে এম ইউসুফ (জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা ইসহাক (নেজামে ইসলাম), ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও অধ্যাপক শামসুল হক (আওয়ামী লীগ), এ এস এম সোলায়মান (কৃষক-শ্রমিক পার্টি), জসিমউদ্দিন ও এ কে মোশাররফ হোসেন (পিডিপি) এবং মং সু প্রু চৌধুরী (পার্বত্য চট্টগ্রাম)।[৬১]

নিক্সন ইয়াহিয়ার দেখভাল করার পক্ষে ছিলেন। শরণার্থী সমস্যা দিন দিন বাড়ছিল এবং তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। নিক্সন ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে চাননি। কিসিঞ্জার নিক্সনকে পরামর্শ দেন, 'আপনি বলুন, শরণার্থীরা শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসতে পারবে। ইয়াহিয়া তখন জবাবে বলবে সে এটিই চায়। মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি ভারতকে সংযত থাকতে বলুন, আমি ইয়াহিয়াকে খোশমেজাজে রাখব।' নিক্সন বেশ তিক্ততার সঙ্গে বলেন, 'ভারতীয়দের দরকার একটি...।' কিসিঞ্জারের তড়িৎ জবাব, 'তারা এমনই বেজন্মা।' নিক্সন কথা শেষ করলেন এই বলে, 'একটি সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ (দরকার)।'[৬২]

ভারত শরণার্থীদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। দরিদ্র দেশটির ওপর এটি ছিল বিরাট এক বোঝা। উদ্বাস্তুদের খরচ মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র সাত কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। নিক্সনের মনে হলো, ৩০ লাখ উদ্বাস্তুর জন্য এই টাকা নিতান্তই সামান্য। আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ভেবেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবার বোধ হয় ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। কিন্তু তা হয়নি। ২২ জুন *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রথম পাতায় একটি খবর ছাপল : সামরিক যন্ত্রাংশ এবং আটটি যুদ্ধবিমান নিয়ে একটি পাকিস্তানি জাহাজ নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি। সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য যন্ত্রাংশ নিয়ে আরেকটি জাহাজ মে মাসেই

ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এক কোটি উদ্বাস্তু

রওনা দিয়ে ইতিমধ্যে করাচির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মার্কিন কংগ্রেসের তদন্ত দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সাড়ে তিন কোটি ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম ২৫ মার্চের আগেই পাঠানোর কথা ছিল। কিসিঞ্জারের লোকেরা বলেছিল, 'আমাদের সামরিক সরবরাহ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবতার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে যেতে হবে।'[৬৩]

ডেমোক্র্যাট দলের সিনেটর ফ্রাংক চার্চ কোস্ট গার্ড পাঠিয়ে মার্কিন সমুদ্রসীমার মধ্য থেকে অস্ত্রবাহী জাহাজটি ধরে আনতে নিক্সনকে অনুরোধ করেন। আরেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি নিক্সন প্রশাসনের 'নীরবতা ও আত্মসন্তুষ্টি' দেখে ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, এটি বিবেকবর্জিত কাজ।[৬৪]

বেশ কিছুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। দূতিয়ালি করছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পাকিস্তানকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে যুক্তরাষ্ট্রের তখন খুব প্রয়োজন। যোগাযোগ হচ্ছিল গোপনে। কিসিঞ্জার বলেছিলেন, ইয়াহিয়াকে যেভাবেই হোক ছয় মাসের জন্য টিকিয়ে রাখতে হবে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারাকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'আমাদের ছয় মাসের সময় দরকার, কিংবা তার চেয়েও কম, তিন মাসের জন্য এদের (ইয়াহিয়াকে) দরকার। তারপর আমরা দয়া দেখাব।'[৬৫]

দুনিয়াজুড়ে বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে সংবাদ ছাপা হচ্ছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জুনের শেষ দিকে জানায়, পূর্ব পাকিস্তানে কমপক্ষে দুই লাখ লোক মারা গেছে। বিশ্বস্ত কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ সিডনি শনবার্গের রিপোর্টে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে কমপক্ষে দুই লাখ বাঙালি নিহত হওয়ার খবর ছাপা হয়।[৬৬] তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার প্রতি নিক্সন প্রশাসনের ভালোবাসার কমতি ছিল না। নিক্সন মনে করতেন, 'ইয়াহিয়া একজন ভালো মানুষ। হাজার মাইলের দূরত্বে একটি দেশের দুই অংশকে একসঙ্গে রাখার কঠিন কাজটি করে যাচ্ছেন তিনি।'[৬৭]

ভারতের হিসাব অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষে শরণার্থীর সংখ্যা ৮০ লাখে দাঁড়ায়। শিশুদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। শরণার্থীদের মধ্যে দুই বছরের নিচে শিশু ছিল ১২ লাখ। এদের মৃত্যুহার ছিল অভিবাসী অন্য শিশুদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। বাঙালি মাত্রেই পাকিস্তানিদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই আক্রোশ ছিল বেশি। মোট ৮০ লাখ ৪৫ হাজার শরণার্থীর মধ্যে ৭১ লাখ ২০ হাজার ছিল 'হিন্দু'।[৬৮]

নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের পক্ষে যতই ওকালতি করুক না কেন, গণমাধ্যমের কল্যাণে মার্কিন জনমত বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছিল। এ সময় দৃশ্যপটে হাজির হন জনপ্রিয় গায়ক জর্জ হ্যারিসন। প্রথাবিরোধী ব্যান্ড 'বিটলসের' এই সাবেক তারকার সঙ্গে ভারতীয় সেতারবাদক রবিশঙ্করের ঘনিষ্ঠতা ছিল। হ্যারিসন রবিশঙ্করের কাছে ছয় সপ্তাহ সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। রবিশঙ্কর বাংলাদেশের জন্য একটি কনসার্টের উদ্যোগ নেন। হ্যারিসন তাতে সাড়া দেন। আগস্টের প্রথম দিন নিউইয়র্কের ম্যানহাটান এলাকায় ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আয়োজন করা হলো 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। হ্যারিসন আরও কয়েকজন সঙ্গী পেলেন—ড্রামবাদক রিংগো স্টার, রক গায়ক বব ডিলান, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, গিটারবাদক এরিক ক্ল্যাপটন, রবিশঙ্করসহ কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী। তরুণ দর্শক-শ্রোতারা গান শুনতেই এসেছিলেন। রবিশঙ্কর বাঙালিদের কষ্টের বর্ণনা দেন। গানের ফাঁকে ফাঁকে শরণার্থী শিবিরগুলোর দুরবস্থা এবং অনাহারে মরে যাওয়া শিশুদের ভিডিও দেখানো হয়। *ভিলেজ ভয়েস* পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছিল, 'কর অবকাশ পাওয়া কয়েকটি ডলার খরচ করতে আসা মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলার জন্য এটি ছিল একটি মহৎ চেষ্টা।'[৬৯]

শুরুতেই রবিশঙ্কর, উস্তাদ আলী আকবর খান এবং উস্তাদ আল্লারাখা খান বাজালেন 'বাংলা ধুন'। বব ডিলান গাইলেন 'আ হার্ড রেইনস আ গনা ফল' এবং 'ব্লোইন ইন দ্য উইন্ড'-এর মতো গান। যেন নিক্সনকে ইঙ্গিত করে পরম আবেগে গেয়ে উঠলেন :

যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ-নীতির প্রতিবাদে নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের সামনে উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের সদস্যদের অনশন ধর্মঘট। দৈনিক *প্যাট্রিয়ট*-এ প্রকাশিত ছবিতে ফ্রিডা ব্রাউন, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগমসহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

হাউ মেনি ডেথ্স উইল ইট টেক টিল হি নোওজ
টু মেনি পিপ্‌ল হ্যাভ ডাইড?

সবার শেষে জর্জ হ্যারিসন গাইলেন :

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ
সাচ আ গ্রেট ডিজাস্টার, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড
বাট ইট সিওর লুকস লাইক আ মেস
আই হ্যাভ নেভার নোন সাচ ডিসট্রেস।

কনসার্টটি ছিল পুরোপুরি সফল। বেলা আড়াইটায় কনসার্টটি শুরু হয়। ওই দিন রাত আটটায় দ্বিতীয়বারের মতো কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কনসার্টের টিকিট বিক্রি করে সংগঠকেরা ২০ হাজার ডলার জোগাড়ের আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রায় আড়াই লাখ ডলার পাওয়া গিয়েছিল টিকিট বিক্রি করে। পুরো টাকাটাই ইউনিসেফের ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়।[৭০]
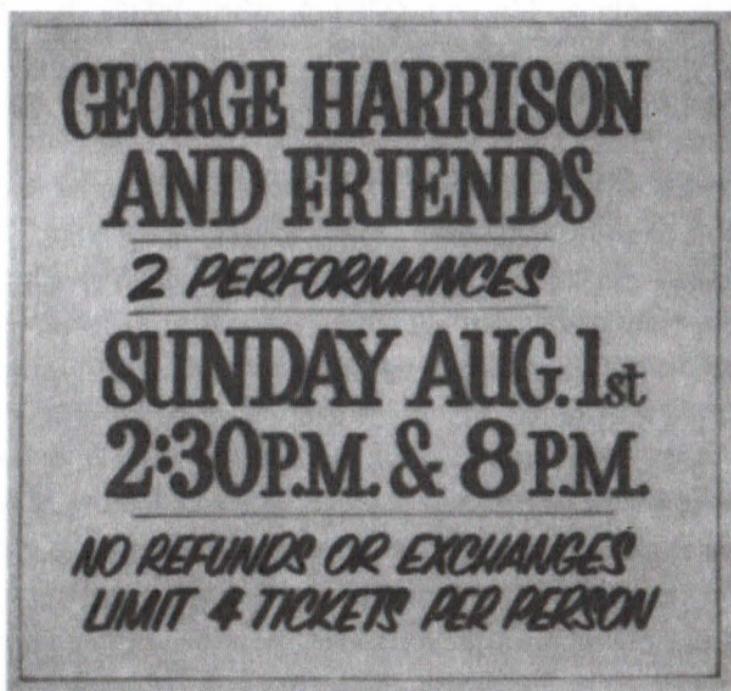
জোয়ান বায়েজ এর আগে ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের প্রতি সংহতি জানিয়ে গান গেয়েছিলেন। স্ট্যামফোর্ড আর মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কনসার্টে তিনি গাইলেন 'সং ফর বাংলাদেশ'।[৭১]

প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিলেই। 'স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে লেখা

বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের সই করা একটি চিঠি ২৪ এপ্রিল (১৯৭১) পশ্চিম বার্লিন থেকে সাধারণ 'এয়ার মেইল' ডাকে পাঠানো হয়েছিল। চিঠিটি স্টেট ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড সার্ভিস ডিভিশনে তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করেনি।[৭২]

মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছিল। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় সত্তরের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এক সমাবেশে বাংলাদেশের জাতীয় পরিষদের ১১০ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছিলেন :

> ...পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিকল্প কোনো প্রস্তাব আপনাদের কাছে, বাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তৎসত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান সাহেবের কাছে বলেছিলাম, আহ্বান জানিয়েছিলাম যুদ্ধ বন্ধ করুন। আমরা দশ লক্ষ মরেছি, তোমার ১৫ হাজার সেনাকে তো ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা খতম করেছে।...তাই যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধান করো।

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর একটি পোস্টার

(১) বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করো। (২) বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দাও। (৩) সমস্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করো। আর (৪) যে ক্ষতি করেছ তার ক্ষতিপূরণ দাও। এই চার শর্ত আমি দিয়েছিলাম শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য। ইয়াহিয়া খান প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, ২৮ জুন তারিখে। ২৮-এর পর থেকে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়েছে। এখন বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বাংলার মাঠে, প্রান্তরে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে যুদ্ধের মাধ্যমে।[৭৩]

পাকিস্তানের অখণ্ডতা মেনে নেবেন, এ রকম বাঙালি রাজনীতিকদের সঙ্গে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের একটি গোপন বৈঠকের সম্ভাবনাকে ইয়াহিয়া স্বাগত জানিয়েছিলেন। নিক্সন প্রশাসন আওয়ামী লীগের মধ্যে এ ধরনের প্রভাবশালী প্রতিনিধির খোঁজ করেছিল। ইয়াহিয়া আলোচনায় আগ্রহী, এমন একটি বার্তা বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭৪]

কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট অফিসের পলিটিক্যাল অফিসার জর্জ বি গ্রিফিনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য কাজী জহিরুল কাইয়ুমের প্রথম যোগাযোগ হয়। ৩১ জুলাই গ্রিফিনের সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ কথা বলার জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন। মোশতাক অবশ্য বিষয়টি পরে অস্বীকার করেছিলেন। কাইয়ুম গ্রিফিনকে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতারা এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক মীমাংসা চান এবং যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়।

৭ আগস্ট কাইয়ুম আবার গ্রিফিনের সঙ্গে দেখা করে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, কেবল যুক্তরাষ্ট্রই একটি সফল সমঝোতার ব্যবস্থা করতে পারে এবং এই সমঝোতা-প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবকে রাখতে হবে। ইয়াহিয়া যদি মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেন, আপস-মীমাংসার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। কাইয়ুম আরও বলেন, মন্ত্রিসভাসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের জনগণের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যদি মুজিবের কিছু হয়, তাহলে তাঁরা কোনো চুক্তিতে আসতে পারবেন না। কিন্তু মুজিব নিজেই যদি সমঝোতা করেন, বাঙালিরা তা মেনে নেবে, যদি আগের অবস্থায়ও ফিরে যেতে হয়। কাইয়ুম বলেন, এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তার ক্ষমতা দিয়ে মুজিবের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, তাঁদের এই আলোচনা যেন পাকিস্তান সরকারকে জানানো হয় এবং অনুকূল পরিস্থিতি সাপেক্ষে ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেলে মোশতাক এবং তিনি আলোচনার জন্য পাকিস্তানে যাবেন। মোশতাক মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চান, কিন্তু জানেন না কীভাবে এর ব্যবস্থা হবে।[৭৫]

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের ভাষ্যে। কিসিঞ্জারের পরামর্শে নিক্সন পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক' করার উদ্যোগ নেন। তিনি ইয়াহিয়া খানকে বলেন যে কলকাতায় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করা দরকার এবং তাঁদের একটি দলকে নিরাপত্তা দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে আসা উচিত, যাতে তাঁরা শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলে একটি সমাধান বের করতে পারেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হবে। তবে এতে ভারতীয় হস্তক্ষেপ এড়ানো যাবে এবং রক্তপাত কমবে।[৭৬]

১২ আগস্ট ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাস সতর্কবার্তা জানিয়ে বলে, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ পাকিস্তানের জন্য খুব স্পর্শকাতর এবং এটিকে যত কম গুরুত্ব দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। ১৬ আগস্ট বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার বৈঠকে মার্কিন কনস্যুলেটের সঙ্গে কাইয়ুমের যোগাযোগের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কাইয়ুম এরপর একাধিকবার জর্জ গ্রিফিনের সঙ্গে দেখা করেন। তত দিনে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ সরকার একটি অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। সরকারের অবস্থান হলো, একমাত্র মুজিবই পাকিস্তানের সঙ্গে 'ডিল' করবেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইয়াহিয়াকে (ক) শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে; এবং (খ) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সব সদস্যসহ বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সবার প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হবে।[৭৭] মন্ত্রিসভার এই অবস্থান ছিল প্রকারান্তরে ২৫ মার্চের আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া।

মুজিবনগর সরকারের সামর্থ্য নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সংশয় ছিল। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নির্দলীয় লোকদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকার দুশ্চিন্তায় ছিল। আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রত্যয়নপত্র ছাড়া কাউকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতে চায়নি। ইন্দিরার মুখ্যসচিব পি এন হাকসার সব দলকে নিয়ে একটি জাতীয়ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে তাজউদ্দীনকে বলার জন্য ইন্দিরাকে অনুরোধ করেন।[৭৮]

২৮ আগস্টের বৈঠকে তাজউদ্দীন ছাড়া বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সব সদস্য পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে একমত হন। ওই দিন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পরিকল্পনার চেয়ারম্যান দুর্গা প্রসাদ ধরের সঙ্গে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার কয়েকটি বৈঠক হয়। ডি পি ধর একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি তৈরি করার জন্য চাপ দেন। ধরের চেষ্টা ছিল মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি যাতে বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। ৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় পত্রপত্রিকায় সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠনসংক্রান্ত একটি খবর ছাপা

হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মন্ত্রিসভার সব সদস্য, মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মণি সিংহ ও মনোরঞ্জন ধর।[৭৯]

আওয়ামী লীগ ভারতের সমর্থন নিয়ে এককভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে চেয়েছিল। অস্থায়ী সরকারের প্রতি সব মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণ আছে কি না, এটি প্রমাণ করার জন্য অস্থায়ী সরকার 'তড়িৎগতিতে অদৃশ্য স্থান থেকে মওলানা ভাসানীকে একটি অকেজো পরামর্শদাতা কমিটির নাম করে বিশেষভাবে আহূত এক গোপন বৈঠকে উপস্থিত করে।' বৈঠকের সময় মন্ত্রিসভার

বাংলা দেশ আওয়ামী লীগ

মুজিবনগর

সভাপতি :
শেখ মুজিবুর রহমান

পূর্ব সূত্র............ তাং..................

1) Development of International Political Trend — in respect of Bangladesh

2) Defence Deptt. —
(a) EBR, EPR, ANS, MUJHD, POLICE
(b) Training facility.
(c) Weapons
(d) Ration
(e) Tents.
(f) Allowance.
(g) Medical cover.
(i) ADS
(ii) AMBULANCE
(iii) HOSPITAL

3) MEDICAL DEPTT: —

4) EDUCATION —

5) INFORMATION AND BROADCASTING: —

6) GENL ADMN: — (i) Zonal Council

7) Postage

সহ সভাপতি :
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
মোঃ মনসুর আলী
খন্দকার মোশতাক আহ্‌মদ

সাধারণ সম্পাদক :
তাজউদ্দীন আহ্‌মদ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের হাতে লেখা তারিখবিহীন নোট

সদস্যপরিবেষ্টিত মওলানা ভাসানীর ছবি তোলা হয়। এই ছবি ছিল অস্থায়ী সরকারের কাছে মহামূল্যবান দলিল।[৮০]

২৩ সেপ্টেম্বর কাইয়ুম গ্রিফিনের সঙ্গে দেখা করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের গোপন যোগাযোগের বিষয়টি ভারত সরকার জেনে গেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা অশোক রায় ২১ সেপ্টেম্বর সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নজরুল তা স্বীকার করেন। অশোক রায় নজরুলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কনস্যুলেটের পলিটিক্যাল অফিসারটি খুবই ধূর্ত এবং সে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এ ধরনের যোগাযোগের ব্যাপারে ভারত সরকারের কোনো আপত্তি নেই। তবে তার পরামর্শ হলো, এ ধরনের বৈঠক ভারতের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। পরে নজরুল ইসলাম অশোক রায়ের মন্তব্য নিয়ে কাইয়ুমের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, অশোক রায় পছন্দ করুক বা না করুক, নজরুল ইসলাম পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে কথা বলবেন।[৮১]

নয়াদিল্লিতে *টাইম* ম্যাগাজিনের ব্যুরোপ্রধান ভ্যান কগিন ২৬ সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমদের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। ওই সময় মোশতাক কগিনের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, কেমন করে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। কগিন তাঁকে কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেটে কনসাল জেনারেল অথবা পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। এরপর মোশতাক ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম হোসেন আলীকে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বলেন।[৮২]

কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেটের পলিটিক্যাল অফিসার জর্জ গ্রিফিনের সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের কথা হয় ২৮ সেপ্টেম্বর। মোশতাকের নির্দেশে রাষ্ট্রদূত হোসেন আলীর বাড়িতে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার কনস্যুলেট থেকে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠানো টেলিগ্রামে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। টেলিগ্রামের শুরুতেই একটি সারসংক্ষেপ ছিল :

বিষয় : বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ—মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক

সূত্র : কলকাতা ২৫৭০

সারমর্ম : কনস্যুলেট জেনারেলের পলিটিক্যাল অফিসার ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহমদের সঙ্গে ৯০ মিনিট কথা বলেছেন। পাকিস্তানকে অব্যাহত সমর্থন দেওয়ার কারণে ২৫ মার্চের

পর পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে, তার জন্য মোশতাক যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সরাসরি দায়ী করেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে চায়। তিনি আশা করেন, যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থেই বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা পেতে ব্যবস্থা নেবে। তিনি সাবধান করে দিয়েছেন, বাংলাদেশের বামপন্থীদের কবজায় চলে যাওয়া ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ নেওয়ার সময় ফুরিয়ে আসছে।

পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই, তবে তিনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর অনুরোধের একটি আনুষ্ঠানিক জবাব চেয়েছেন তিনি। পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে তিনি মাঝেমধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি মনে করেন অন্য কোনো মাধ্যমে এই যোগাযোগ হবে না। তিনি আরও বলেছেন, অন্য কাউকে তিনি যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেননি। তবে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে সদিচ্ছাসম্পন্ন আরও নেতা আছেন এবং তাঁরা 'আমেরিকান মন' বোঝার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে ভবিষ্যতে যোগাযোগ করতে পারেন। সারমর্ম সমাপ্ত।[৮৩]

হোসেন আলী মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসার জর্জ গ্রিফিনের সঙ্গে ২৪ সেপ্টেম্বর যোগাযোগ করে ২৮ তারিখের বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রিফিন ও মোশতাক হোসেন আলীর বাড়িতে এক ঘণ্টা একান্তে কথা বলেন এবং এরপর হোসেন আলী আলোচনায় যোগ দেন। বৈঠক আরও আধা ঘণ্টা চলে। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রিফিনের পাঠানো টেলিগ্রামের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

পলিটিক্যাল অফিসার জানতে চান বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে কী আশা করে? জবাবে মোশতাক বলেন, ইয়াহিয়াকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করুন। আমার নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করতে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করুন। বাস্তবিক পক্ষে আপনারা আমাদের জনগণকে চরমপন্থীদের হাতে চলে যেতে বাধ্য করছেন। আমাদের কী অপরাধ? আপনাদের অবশ্যই ইয়াহিয়াকে থামানোর জন্য চাপ দিতে হবে।...দশ লাখ লোক মারা গেছে, আরও ৯০ লাখ মানুষ পালিয়ে ভারত ও বার্মায় যেতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে তারা অবাঞ্ছিত...আপনারা ইয়াহিয়াকে বলতে পারেন, 'আমাদের অস্ত্র ব্যবহার কোরো না।'...পলিটিক্যাল অফিসার যখন বললেন চীন থেকে পাকিস্তান অনেক অস্ত্র পেয়েছে, তখন মোশতাক বললেন, 'চীনারা বলে আপনারা পাকিস্তানকে বেশির ভাগ অস্ত্র দিয়েছেন।'

মোশতাক বলেন, তিনি কমিউনিস্ট নন, এমনকি কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীলও নন। বর্তমান নীতি বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার চরমপন্থীদের সাহায্য করছে এবং সব গণতান্ত্রিক অর্জন থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া এখন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। 'যদি আপনারা চান, আপনারা তাঁকে সঠিক বিকল্প দেখাতে পারেন।'

ওই সময়ের ঘটনাবলি প্রসঙ্গে মোশতাক বলেন, বাংলাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে কমিউনিস্টদের নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম চিন্তা ছিল যুদ্ধ পরিষদ তৈরি করা, যা তিনি এবং অন্য নেতারা ঠেকিয়েছেন। এরপর তারা একটি লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করতে চেয়েছিল। আমি যদ্দুর পারি এটি ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু তিনি 'একটি নিম্নতম কর্মসূচি' গ্রহণে রাজি হতে বাধ্য হয়েছেন। কনসালটেটিভ কমিটি। বর্তমানে এটি নিছক একটি উপদেষ্টা পরিষদ। 'আগামী ছয় মাসে আমাদের আরও অনেক কিছু গিলতে হবে যদি আপনারা হস্তক্ষেপ না করেন।' আমরা 'আপনাদের ওপর নির্ভর করতে চাই।'

মোশতাক বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বাংলাদেশ সরকারের চাওয়া ও নীতিগুলো জানাতে এবং এ ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের জবাব জানতে চান। বাংলাদেশ সরকার কী চায়, তিনি তার একটি তালিকা পলিটিক্যাল অফিসারকে দিতে চান।...বাংলাদেশ সরকারের চাওয়াগুলো হলো :

ক) বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা;
খ) শেখ মুজিবের মুক্তি;
গ) স্বাধীনতার পর জাতীয় পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্য এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য দ্রুত মানবিক সাহায্য;
ঘ) স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন;
ঙ) বাংলাদেশের নেতাদের কাছে দেশ ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি;
চ) প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা;
ছ) হাইকমিশনারের মাধ্যমে পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হবে একমাত্র মাধ্যম।

মোশতাক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে, না হলে রুশরা এটি করবে। মোশতাক আরও বলেন, তিনি এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্য নেতারা চান, যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা নিক এবং তারা সোভিয়েত-মতলব সম্পর্কে সজাগ। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থা বর্তমানে একটু নাজুক। তিনি বলেন, যদি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো না যায়, বাংলাদেশ সরকার আবার যুদ্ধ শুরু করবে যত দিন পর্যন্ত বিজয় না আসে, তোমাদের অস্ত্র থাকলেও। এ রকম

পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ আন্দোলন চরমপন্থার দিকে চলে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। রুশরা এটি কবজা করতে চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই।...

মোশতাক ও পলিটিক্যাল অফিসার তাঁদের আলোচনা এবং ভবিষ্যতে যদি আরও আলোচনা হয়, তা ব্যক্তিগত ও গোপনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে বলে একমত হন।...বাংলাদেশ সরকারের চাওয়াগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে জানাতে চায়, জানাতে পারে, যদি তারা মনে করে এতে সুফল পাওয়া যাবে।...তিনি বলেন, তিনি জানেন ওয়াশিংটন এত বড় যে মাঝেমধ্যে ছোট জিনিস (বাংলাদেশ) তার নজরে পড়ে না। কিন্তু তাঁর আশা, সাত কোটি মানুষ এবং ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশকে উচ্চ পর্যায়ে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হবে।...[৮৪]

'বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কেবল শেখ মুজিবই কথা বলবেন', এই দাবি শোনার পর কিসিঞ্জার ধরে নেন, বাঙালিরা নিঃশর্ত স্বাধীনতা চায় এবং আলোচনা সম্ভবত এখানেই শেষ। এ প্রসঙ্গে কিসিঞ্জারের মন্তব্য ছিল, 'মুজিবকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে ইয়াহিয়া সমঝোতা করবেন, এটি ভাবাই যায় না, যদি-না ইয়াহিয়া শতকরা ১০০ ভাগ বদলে গিয়ে থাকেন।'[৮৫]

ভারত দাবি করেছিল, শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানকে সমঝোতায় আসতে হবে, কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে পাশ কাটিয়ে একটি টেকসই সমাধান কীভাবে সম্ভব। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা 'পূর্ব পাকিস্তান' সমস্যাকে মনে করত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং ভারতের এতে নাক গলানো উচিত নয়। সমঝোতা প্রসঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স বলেছিলেন, ইয়াহিয়া যাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন, তার সঙ্গে তিনি কীভাবে কথা বলবেন? ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্যসচিব পি এন হাকসার জবাবে বলেছিলেন, 'গান্ধী সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অনেক আজেবাজে কথা বলেছেন। তার পরও ব্রিটিশ সরকার গান্ধী ও নেহরুর সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। কিন্তু মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছাই নেই ইয়াহিয়ার।'[৮৬]

এ সময় ভারত অস্ত্র জোগাড়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার মধ্যবর্তী ছোট্ট দেশ লিচেনস্টেইনে অবস্থিত অস্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠান 'সালগাদ' ইসরায়েলের জন্য অস্ত্র তৈরি ও জোগান দিত। সালগাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্লোমো জাবলুডোয়িচের সঙ্গে হাকসারের ১৯৬৫ সালে লন্ডনে পরিচয় হয়। হাকসারের অনুরোধে জাবলুডোয়িচ ৩ আগস্ট লন্ডনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার প্রকাশ কাউলের সঙ্গে দেখা করে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। জাবলুডোয়িচ ইরান ও তুরস্কের জন্য

তৈরি অস্ত্রের চালান ভারতে পাঠিয়ে দেন। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মজুদ থেকে কিছু অস্ত্র আকাশপথে ভারতে পাঠানো হয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার ইন্দিরা গান্ধীকে এক চিঠিতে জানান, ভারতের বিপদের সময় ইসরায়েল অতীতেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এখনো তা করে যাচ্ছে। চিঠিতে তিনি সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। ইন্দিরা এই অনুরোধ এড়িয়ে যান।[৮৭]

এ সময় ইসরায়েল সরকার ভারতের ডানপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা বাংলাদেশের কয়েকজন সাংসদের মাধ্যমে ইসরায়েলের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। এটি জানতে পেরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব কামাল সিদ্দিকী সিপিএমের পত্রিকায় তথ্যটি জানিয়ে দেন। সংবাদটি ওই পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর ইসরায়েলি লবির তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।[৮৮]

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ তৈরি করতে পারেন এই আশঙ্কায় ডি পি ধর মোশতাককে সরিয়ে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করার পরামর্শ দেন। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাওয়ার মতো জ্যেষ্ঠতা দলের মধ্যে আবদুস সামাদ আজাদের ছিল না। মস্কোপন্থী পত্রিকা *মেইনস্ট্রিম*-এর সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তী ডি পি ধরের কাছে আজাদের নাম সুপারিশ করেছিলেন। মন্ত্রিসভায় এ রকম পরিবর্তন আনলে সরকারের মধ্যকার কোন্দল প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, এই চিন্তা থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন কোনো ধরনের রদবদলে যাননি। তবে মোশতাক যাতে প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে জাতিসংঘে না যেতে পারেন, তাজউদ্দীন সেই ব্যবস্থা করেন। মোশতাক নামমাত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে থেকে যান। জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।[৮৯]

সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সময় ইয়াহিয়া কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, প্রতিনিধিদলে থাকবেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি রাজনীতিবিদেরা, যাতে বিশ্ববাসীকে বোঝানো যায় যে বাঙালিরা পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে। ইয়াহিয়া পিডিপি নেতা এবং *দ্য পাকিস্তান অবজারভার*-এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে প্রতিনিধিদলের নেতা হতে বলেন। হামিদুল হক তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন :

> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং তাঁর পূর্বসূরি আইয়ুব খানের নীতির সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না বিধায় রাজি হইনি। পরে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নুরুল আমিনকে মনোনীত করা হয়। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে আগ্রহী

ছিলেন। কিন্তু লম্বা সফরে যাওয়ার মতো শারীরিক সামর্থ্য তাঁর ছিল না। শেষমেশ মাহমুদ আলী মনোনীত হন। তিনি আমার মতামত চাইলে আমি তাঁকে যাওয়ার পরামর্শ দিই।[৯০]

প্রতিনিধিদলে মাহমুদ আলীর সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান এবং ১৯৬৫-৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মুসলিম লীগদলীয় সদস্য বেগম রাজিয়া ফয়েজ।

ডি পি ধর তাঁর সর্বশেষ কলকাতা সফরের সময় খন্দকার মোশতাককে মার্কিন সরকারের সঙ্গে গোপনে সলাপরামর্শ করার জন্য ভর্ৎসনা করেন। ধর বলেন, তিনি সব জানতে পেরেছেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসকে সবকিছু বলে দিয়েছে। ধর মোশতাককে 'ট্রেইটর' (বেইমান) বলেছিলেন। বিষয়টি কাইয়ুম ২৭ নভেম্বর মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন। পলিটিক্যাল অফিসারকে কাইয়ুম বলেছিলেন, গোটা মন্ত্রিপরিষদ ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে দিল্লি গেছে। তিনি (কাইয়ুম) পরামর্শ দিয়েছেন, কলকাতায় আওয়ামী লীগের মধ্যে আলোচনা না করে দিল্লিতে তাঁরা যেন কোনো কিছুতে সই না দেন।[৯১]

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ এমন একটি সময় হচ্ছিল, যখন পাকিস্তানে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচার চলছে। একটি গোপন সামরিক আদালতে ৬ আগস্ট এই বিচার শুরু হয়। এই আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রহিমুদ্দীন খান। এই সংবাদ পাওয়ার পর ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। ১১ আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে একটি বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি বলেন :

> আমরা আশঙ্কা করছি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার অজুহাত হিসেবে তথাকথিত বিচারকে ব্যবহার করা হবে। এর ফলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির অবনতি হবে এবং ভারতে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর অনুভূতির কারণে ভারতেও এর চরম প্রতিক্রিয়া হবে। আমরা অনুরোধ করছি, এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার বৃহত্তর স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেন একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, সে জন্য আপনি তাঁর ওপর আপনার প্রভাব খাটান।[৯২]

নিক্সন ইন্দিরার এই বার্তার কোনো জবাব দেননি।[৯৩]

১৯ আগস্ট ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ এস ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করে বলেন, শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ড দেওয়া ঠিক হবে না, একজন বন্ধু হিসেবে ইয়াহিয়া খানকে তিনি এই পরামর্শ দেওয়া উচিত বলে মনে

করেন। জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, ফারল্যান্ডের আশঙ্কা অমূলক। শেখ মুজিবের জন্য এ কে ব্রোহির মতো পাকিস্তানের সবচেয়ে ঝানু উকিলকে নিয়োগ করা হয়েছে। সামরিক আদালতকে বলা হয়েছে, বিচার যেন সতর্কতার সঙ্গে ও নিরপেক্ষ হয়। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ। যদি এ রকম কোনো রায় হয়, তাহলে মুজিবের পক্ষ থেকে ক্ষমার আবেদন করা হবে এবং তিনি ওই আবেদন গ্রহণ করবেন।

ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা হলো, ক্ষমার আবেদনটি তিনি দুই মাস ঝুলিয়ে রাখবেন এবং এর মধ্যে অসামরিক সরকার গঠিত হলে এই আবেদন তখন তাদের মাথাব্যথার কারণ হবে। তখন মুজিবের প্রাণদণ্ড কার্যকর করার আশঙ্কা নেই কিংবা থাকলেও খুব সামান্য। ইয়াহিয়া আরও বলেন, 'আমি নিশ্চিন্ত এবং আপনিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যদিও মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক, তবুও আমি তাঁকে মারব না।'[৯৪]

শেখ মুজিবের গোপন বিচার নিয়ে অনেকেরই উৎকণ্ঠা ছিল। ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান মস্কো যান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে কথা বলেন। গ্রোমিকো পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, '৮০ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে গেছে। তারা তো অকারণে ঘর ছাড়েনি। জীবনের নিরাপত্তা নেই বলেই তারা দেশ ত্যাগ করেছে এবং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তান কিছুই করছে না।' শেখ মুজিব প্রসঙ্গে গ্রোমিকো বলেন, 'আমরা তাঁর সম্পর্কে খুব কম জানতাম। পরে জেনেছি, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। তাঁকে কঠিন সাজা দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ববাসী তার নিন্দা জানাবে। কূটনীতির ভাষার মারপ্যাঁচ বাদ দিয়ে আমি সোজাসুজি বলতে চাই যে এটি ঠিক হচ্ছে না এবং এ ধরনের পদক্ষেপ আপনাদের পক্ষে যাবে না।'[৯৫]

কিছুদিন পর অক্টোবরে পারসিপেলিস শহরে ইরানি রাজতন্ত্রের ২৫০০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পোদগর্নির সঙ্গে ইয়াহিয়ার দেখা হয়। তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

পোদগর্নি : আপনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শুরু করছেন না কেন? যেকোনো শান্তিপ্রক্রিয়ার জন্য তিনি অপরিহার্য। আপনি যদি তাঁকে মুক্তি দেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তাঁর সমর্থন আদায় করতে পারেন, তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ইয়াহিয়া : আমি ওই বেইমানের সঙ্গে কখনো কথা বলব না। আমি একটি পরিকল্পনা বানাচ্ছি এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এর ফল পাওয়া যাবে।

পোদগর্নি : মি. প্রেসিডেন্ট, এমন কোনো পরিকল্পনার ওপর ভরসা করবেন না, যা বাস্তবায়িত হবে না। আপনার হাতে অঢেল সময় নেই।[৯৬]

ইয়াহিয়া দাবি করেছিলেন, মুজিবকে তিনি প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথা কখনো ভাবেননি। পরে ভুট্টো যখন ক্ষমতায় এবং ইয়াহিয়া অন্তরীণ, তখন তিনি ডায়েরি লিখতেন। ১৯৮০ সালে মৃত্যুর আগে তিনি লিখেছিলেন, 'ভুট্টো মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিল।' একাত্তরের অক্টোবরে ইরানের রাজতন্ত্রের ২৫০০তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরানে যাওয়ার সময় ভুট্টো তাঁকে (ইয়াহিয়াকে) বলেছিলেন সামরিক আদালতের কাজ বন্ধ করে মুজিবকে তাড়াতাড়ি খতম করে দিতে। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, 'আদালতের শুনানি শেষ না হওয়া অবধি আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। সে বলল, "ইরানে আমন্ত্রিত সব রাষ্ট্রপ্রধান মুজিবকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দেবে। তাই আমাকে এখনই কাজটি করতে হবে, এবং সেটি হলো তার ফাঁসি।"'[৯৭]

ইয়াহিয়া যখন ভুট্টোর কাছে ডিসেম্বরে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, তখন তিনি ভুট্টোকে বলেছিলেন, আদালতের শুনানি শেষ হয়েছে এবং এখন এটি আইন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করছে। এ জন্য তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ইয়াহিয়া আরও দাবি করেন, 'সে (ভুট্টো) যেভাবে বলে বেড়াচ্ছে আমি নাকি মুজিবকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তাঁকে রক্ষা করেছে। মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! এ ছাড়া তার মতো একজন দাগি মিথ্যাবাদীর কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়? এটি তো মামলার কার্যক্রম, তারিখ ও সময় মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। হাস্যকর ব্যাপার হলো, সরল মুজিব তার (ভুট্টোর) কথা বিশ্বাস করেছেন যে আমি তাঁকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলাম এবং সে তাঁকে বাঁচিয়েছে।'[৯৮]

# শেষ দৃশ্য

বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ১৫ অক্টোবর (১৯৭১) এক চিঠিতে বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান। ৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এখনো কি রাজনৈতিক সমঝোতার পথ খোলা আছে, নাকি গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র পথ? জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'পূর্ব বাংলার জনগণ যা চাইবে, তা-ই হবে। তারা কোন পথে যাবে তা নির্ধারণ করার অধিকার আমাদের নেই। এটি তাদের দেশ, এটি তাদের লড়াই এবং তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'[১]

১৯ অক্টোবর ফ্রান্সের *লা মঁদ* পত্রিকায় ইয়াহিয়া খানের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। বিচারে শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড হলে প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতাবলে মুজিবকে ক্ষমা করে দেবেন কি না এই প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, 'আমাকে দেশের মানুষের মনোভাব জানতে হবে। জনগণ চাইলে আমি ক্ষমা করব।'[২] ৮ নভেম্বর সাপ্তাহিক *নিউজউইক*-এ প্রকাশিত আর্নল্ড ডি বোচগ্রেভকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া বলেন, 'বিচারে তাঁর দণ্ড হলে কী করা হবে, তা প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারে। এটি বড় একটি ঝামেলা। কিন্তু জাতি চাইলে আমি তাঁকে ছেড়ে দেব।'[৩] সরকারি পত্রিকা *পাকিস্তান টাইমস*-এ ইয়াহিয়ার কথার ব্যাখ্যা করে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আদতে মুজিবের মুক্তির কথা ভাবছেন, তবে এটি একান্তই পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপার। ইয়াহিয়ার মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তানের ৪২ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি শেখ মুজিবের আশু মুক্তি চেয়ে যৌথ বিবৃতি দেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে ছিলেন তেহরিক-ই-ইস্তিকলাল পার্টির প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান, লেনিন শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, পাকিস্তান সোশালিস্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম, *পাকিস্তান টাইমস*-এর সাবেক সম্পাদক মাজহার আলী খান, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন

ফেডারেশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ। বিবৃতিদাতাদের বেশির ভাগই ছিলেন বামপন্থী।[৪]

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ প্রশ্নে দূতিয়ালি করার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি সম্মানজনক সমাধান এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য তিনি বিশ্বনেতাদের কাছে দেনদরবার করছিলেন। এই পর্যায়ে নভেম্বরে তাঁর ওয়াশিংটন সফর ঠিক হয়। মার্কিন প্রশাসনের মনোভাবে অবশ্য কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। ইন্দিরা ও মুজিবের ব্যাপারে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ কিংবা শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। ৪ নভেম্বর নিক্সন-ইন্দিরা বৈঠক হয়। বৈঠকে কিসিঞ্জার ও হাকসার উপস্থিত ছিলেন।[৫] এই বৈঠকের পর ওভাল অফিসে কিসিঞ্জারের সঙ্গে নিক্সন একান্তে আলাপ করেন। তাঁদের কথোপকথন থেকে জানা যায় :

নিক্সন : অন্যান্য দেশকে যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দেয়, ভারতকে তার চেয়ে বেশি দেওয়া হয়। তার পরও ওরা এটা স্বীকার করে না। জাহান্নামে যাক তারা।

কিসিঞ্জার : আমি রাখঢাক করে বলব না। এই বেজন্মারা আমাদের সঙ্গে চূড়ান্ত রকমের নিষ্ঠুর খেলা খেলছে। দুর্ভিক্ষ ঠেকানো, আন্তর্জাতিক ত্রাণ সরবরাহ (পূর্ব পাকিস্তানে), অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা, সাধারণ ক্ষমা, একতরফা সেনা প্রত্যাহার, কী না আমরা করেছি। অস্ত্র পাঠানোও শেষ হয়ে গেছে।

নিক্সন : আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাকে ফাঁসি না দেওয়ার ব্যাপারটি পাকিস্তানিরা মেনে নিয়েছে। তাঁর নামটা যেন কী? মুজিব? কীভাবে উচ্চারণ করো?

কিসিঞ্জার : ইয়াহিয়া বলেছে, সে বাংলাদেশের একজন নেতার সঙ্গে দেখা করতে রাজি। না না না, মুজিব নয়। মুজিবের সঙ্গে দেখা করা ইয়াহিয়ার জন্য হবে আত্মহত্যার শামিল।

নিক্সন : ইন্দিরা গান্ধীকে জানাতে হবে, ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যদিও কোনো চুক্তি নেই, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। (ইন্দিরার উদ্দেশে কর্কশ কণ্ঠে) ওল্ড বিচ!

কিসিঞ্জার : আপনাকে প্রকাশ্যে (ইন্দিরাকে) সৌজন্য দেখাতে হবে।...

নিক্সন : তারা বলেছে, তাঁকে (মুজিবকে) ফাঁসিতে ঝোলাবে না—মুজু, মুজু হ্যাঁ, তুমি তাঁর নামটা বলেছ।

কিসিঞ্জার : মুজিব।

নিক্সন : আমি শক্তভাবে (ইন্দিরার সঙ্গে) কথা বলব।[৬]

নিক্সন-ইন্দিরা দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় ৫ নভেম্বর বিকেলে। বৈঠকের পর নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেন, সে (ইন্দিরা) আমাদের নিয়ে খেলছে। এই নারী আমাদের চুষে নিচ্ছে।[৭]

ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি চাল চাললেন। তিনি নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করে একধরনের অন্তর্বর্তী অসামরিক সরকার গঠন করলেন। নুরুল আমিন ছিলেন নামমাত্র প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের জনগণ থেকে তখন তিনি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

এসএফএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান। তাঁর সার্বিক পরিচালনায় সাত হাজার সদস্যের বিএলএফ গড়ে তোলা হয়েছিল। মূলত শেখ মুজিবের অনুগত ছাত্রলীগের বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে এই বাহিনী তৈরি করা হয়। শেখ মুজিব জীবিত ফিরে আসবেন কি না, এ নিয়ে সন্দেহের দোলাচলে ছিলেন এই বাহিনীর চার নেতা—শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ। শেখ মুজিবের সম্ভাব্য অনুপস্থিতিতে দেশের নিয়ন্ত্রণ রাখার রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল হিসেবে বিএলএফকে আলাদা করে দেখা হয়েছিল। অক্টোবরের মধ্যে এই বাহিনীর জেলা ও মহকুমাগুলোয় প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়। মুক্তিবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের তুলনায় তাঁরা উন্নততর ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। ১ অক্টোবর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মণি বিএলএফ সদস্যদের কাছে ১৮ দফা নির্দেশনামা পাঠান। নির্দেশনামায় বলা হয়, সাংগঠনিক কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই সামর্থ্যের বাইরে ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। আরেকটি নির্দেশ ছিল, 'আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি এলাকা দালাল খতম ও রাজাকার দমনের মাধ্যমে বিপদমুক্ত করতে হবে।'[৮] অক্টোবরের শেষ দিকে বিএলএফের নাম পরিবর্তন করে মুজিববাহিনী রাখা হয়।[৯]

মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতাকামী সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। উপদেষ্টা পরিষদটি ছিল নামমাত্র। ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *মুক্তিযুদ্ধ* পত্রিকার নবম সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, 'দুঃখের বিষয়, কোনো কোনো দলের নেতৃত্বের অহমিকা ও বুর্জোয়াসুলভ সংকীর্ণতার জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হয় নাই।'[১০]

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আশঙ্কা দিন দিন বাড়ছিল। ইয়াহিয়া চীনা সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে ভুট্টোকে চীনে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে

TOP SECRET

FOR ALL TEAM, SQDN, & COMPANY LEADERS

1. You are instructed to tacle any of the following target on the 10th of OCTOBER when the ~~MOON~~ MOON would not be in the sky:
    - (a) RAZAKARS OR ENEMY COLLABORATORS
    - (b) THANA
    - (c) PETROL DUMP OR ELECTRIC SUPPLY
    - (d) ENEMY COMMUNICATION such as BRIDGE or WIRELESS STATION etc.
2. No other target is to be tried beyond that.
3. Prior to ur reach the target prope. RECCE should be conducted, assesment MUST be calculated whether our strength is sufficient to cope with the situation.
4. In each district only 30% thanas should be selected for the ground of this ~~operation. The remaining 70% should kept untouched. While tacling a target~~ operation. The remaining 70% should be remain untouched. While tacling a target proper care must be taken that our safe bases or areas where our teams are well-settled are not disturbed. These untouched or undisturbed thanas are to be used as ground of withdrawal.
5. Team Leaders or Sqdn Leaders of nearby thanas MUST sit together, discuss, asses and calculate carefully to select the targets, the ground of operation, bases to be used after action & withdrawal. They must reach to concensus in making all decissions and select a leader from themselves for this particular assignment.
6. All Arms, Ammunitions, & Demolitions are to be counted, assesment is to be ~~made~~ made whether they are sufficiently equipped, both in men & material to take up this TASK.
7. No fresh supply or reinforcement is available to tacle this task. And our people MUST NOT show RISK or exuberance in trying a target incompatiable to their strength. All that they are to do MUST WITHIN THEIR ABILITY.
8. 100 % Gurantee MUST be assured that we dont give any casualty. Last withdrawal is allowed if it is sensed that our surprise would cost or has leaked out or informations are defective.
9. Discussions abou date/ and Targets MUST be kept restricted among the people who will participate. All possible security measures are to be scrupulously adopted.
10. On the 7th of OCTOBER one Corrier MUST reach ~~Within 36 Hours of the action~~ to us at the HQ with objective details& briefs about how much proparations are made for wich target at where.
11. One special Corrier Must reach Within 36 Hours of action to us at the HQ with objective details of how much ~~maximum~~ success we have obtained, and how much loss, if any, we have sustained.
12. Before going to the task special transport and medical resources are to be mobilised.
13. COY H/Q Team MUST keep vigillence on all teams or group of team s within their scope.
14. All this instructions must be followed keeping in mind GUERILLA's prerogatives of independence.
15. Inspite this special mission our policy to give priority to ORGANISATION remains in continuity.
16. Beyond the list we mentioned in ARTICLE 1 better targets are allowed to be tacled if they are easily available and does not involve undue RISK.
17. In tacling the RAZAKARS only the main men are to be taken. And each thana the number should not exceed THREE.
18. EVERY TEAM MUST FOLLOW THE GHQ INSTRUCTIONS SERIOUSLY.

Date: 1.10.71.

By Order
GHQ. Moni

মুজিববাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মণির নির্দেশনামা

গেলেন এয়ার মার্শাল রহিম খান এবং চিফ অব জেনারেল স্টাফ গুল হাসান। নভেম্বরের ৬-৮ তারিখে তাঁরা বেইজিংয়ে চীনা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। চীনা আলোচকদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের নেতারা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন ই। তাঁরা পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থনের আশ্বাস দিলেও সামরিক সমর্থনের ব্যাপারে কোনো অঙ্গীকার করেননি। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে শীত ক্রমেই জেঁকে বসছে। সিকিম সীমান্তে হিমালয়ে চীনা সেনা সমাবেশ করা এ সময় প্রায় অসম্ভব। সুতরাং চীনা সেনাবাহিনী এই মুহূর্তে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।[১১]

চৌ এন লাই 'পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন' রাজনৈতিকভাবে মীমাংসার ওপর জোর দেন এবং শক্তি প্রয়োগ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাবে বলে মন্তব্য করেন। ওই সময় পাকিস্তানে একটি গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে চীন পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে চীনা নেতারা কথা দিয়েছেন। অথচ এ রকম কিছু আলোচনা হয়নি।[১২]

ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) প্রধান কে এফ রুস্তমজির ডায়েরি থেকে জানা যায়, জেনারেল মানেকশ এবং অন্যান্য বাহিনীর প্রধানেরা জানতেন যে যুদ্ধের জন্য তাঁদের তৈরি হতে হবে। কিন্তু তখনো তাঁরা ইন্দিরার মন বুঝে উঠতে পারেননি। ৯ আগস্ট দিল্লিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের ২০ বছর মেয়াদি 'মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' সই হয়। আগস্টের শেষ দিকে ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ সফরে যান। তিনি ঘুরে ঘুরে সামরিক প্রস্তুতি দেখেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি শিবির ঘুরে দেখেন। তখন পর্যন্ত বিএসএফই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দিয়ে আসছিল। সফর শেষে তিনি বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদারকে ডেকে খোলাখুলিভাবে জানতে চান, এই গতিতে চললে ঢাকায় পৌঁছাতে তাদের কত দিন লাগবে? জবাবে গোলক মজুমদার বলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া কখনো সম্ভব নয়।' বিএসএফ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে না, ভারতীয় সেনা ও বিমানবাহিনীর সমর্থন লাগবে। ইন্দিরা একমত হন। তিনি বলেন, তাঁর চিন্তা হলো পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানকে কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে। মজুমদার বলেন, এ জন্য জমি ভালো রকম শুকনো থাকতে হবে, যাতে করে ট্যাংক চলতে পারে। তিনি জানতে চান, কখন সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে? জবাবে ইন্দিরা বলেন, 'ধরুন, নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।'[১৩]

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তেমন জোরালো ভূমিকা ছিল না। সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যার সমালোচনা করলেও মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বলে স্বীকার করেনি। সোভিয়েত

৯ আগস্ট দিল্লিতে 'মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' সই করছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো

ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) নেতা রাজেশ্বর রাও সোভিয়েত নেতা বোরিস পনোমারিয়েভের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনের অনুরোধ জানালে সোভিয়েত নেতা তাঁকে তাড়াহুড়ো না করার এবং ইন্দিরা গান্ধী যেন রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করেন, সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ন্যাপ (মো.) ও কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের জুলাই মাসে গোপনে চীন সফরের খবরটি প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় ভারতের সঙ্গে কৌশলগত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে ৯ আগস্ট ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি সই করে। সে সময় থেকে সোভিয়েত প্রচারে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারণাটি উঠে আসে। মৈত্রী চুক্তির আগে পাকিস্তানকে এক রেখে বাংলাদেশ প্রশ্নের সমাধান করার সোভিয়েত অবস্থান মস্কোপন্থী ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, এই দলগুলো সূচনা থেকেই মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।[১৪]

এই সময় বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের আয়োজন হলে বাংলাদেশ সরকারের এটি প্রতিনিধিদল তাতে যোগ দেয়। দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপ নেতা দেওয়ান মাহবুব আলী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডা. সারোয়ার আলী। ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রশ্নটি

আলোচ্যসূচিতে ঢোকানোর চেষ্টা সফল হয়নি। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলটি স্বাধীনতার সপক্ষে একটি ঘোষণাপত্র সঙ্গে এনেছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো আমাদের সমর্থন করলেও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত বলয়ের দেশগুলো সমর্থন জানায়নি। সে সময় মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত ডি পি ধর প্রতিনিধিদলটিকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সই হতে চলেছে, যা পরে মুক্তিযুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। এই চুক্তির পরোক্ষ ফল হলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার তাগিদ। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। বর্ষীয়ান রাজনীতিক জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডি পি ধরের চেষ্টা আর ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপের কারণে বাংলাদেশ সরকারের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৮ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের সমর্থনের অভাবে এই কমিটি অকার্যকর থাকে। কমিটির সদস্য মাওলানা ভাসানী কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। মোজাফ্‌ফর আহমদও তাঁর হতাশার কথা গোপন রাখেননি। যদিও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পর মস্কো বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জোরদার করে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপাদান রয়েছে। সাক্ষাৎকারে পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন :

> ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে রাজেশ্বর রাও, এন কে কৃষ্ণান, ভূপেশ গুপ্ত, ভবানী সেন, কল্পনা দত্ত যোশী, রমেশচন্দ্র প্রমুখ আমাদের জন্য যা করেছেন, তা ভোলার নয়। তাঁদের কেউ কেউ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম। মে মাসেই আমাদের পার্টির সদস্যরা সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেছিলেন। অনেক জায়গায় আমাদের প্রশিক্ষণ নিতে বাধা দেওয়া হয়। তবে ২ নম্বর সেক্টরে মেজর খালেদ মোশাররফের চেষ্টায় আমাদের দলের অনেকেই প্রশিক্ষণ পায়। তিনি বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পরে ভারত সরকারের সহযোগিতায় আমাদের ছেলেদের জন্য বিশেষ গেরিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল আসামের তেজপুরে। মুক্তিবাহিনীতে (এফএফ) আমাদের যৌথ বাহিনীর ১২ হাজার তরুণ যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ গেরিলাবাহিনীর সদস্য ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানী আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা

দিয়েছিলেন। আমাদের গেরিলাবাহিনীর নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ, চৌধুরী হারুনর রশীদ, কমান্ডার আবদুর রউফ প্রমুখ।[১৫]

এপ্রিলেই জেনারেল মানেকশ ইন্দিরাকে জানিয়েছিলেন ২৫ নভেম্বরের আগে তাঁদের প্রস্তুতি শেষ হবে না। ১৫ নভেম্বর মে. জেনারেল জ্যাকব মে. জেনারেল ইন্দরজিত সিং গিলকে ব্যক্তিগত এক বার্তায় বলেন, 'পরিস্থিতি দ্রুত আক্রমণের

বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি লাভ

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

কাহারা পক্ষে, কাহারা বিপক্ষে

ভুটানও স্বীকৃতি দিল

মোজাফ্‌ফরের অভিনন্দন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র

জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে

রাশিয়ার ভেটোতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত

সম্পাদকীয়

একটি সময়োচিত সিদ্ধান্ত

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত ন্যাপ-এর মুখপত্র *নতুন বাংলায়* ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার খবর

জন্য তৈরি। বর্ষাকাল শেষ। সেনাবাহিনী তৈরি হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে এবং হিমালয়ের ঠান্ডা আবহাওয়া চীনা সেনাদের যেকোনো পদক্ষেপ পর্যুদস্ত করবে।'[১৬]

২ ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তানি সামরিক কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি ইয়াহিয়ার কাছে একটি দুঃসংবাদ পাঠান, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী যশোর দখল করে নিয়েছে।' যদিও যশোর মুক্ত হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর। ইয়াহিয়া সিদ্ধান্ত নেন, পাকিস্তান বিমানবাহিনী একযোগে ভারতের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাবে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর শক্তি এত বেশি যে তারা আঘাত হানার আগেই পাকিস্তানকে তার কাজটি করে ফেলতে হবে। ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ খোলামেলাভাবে শুরু হয়ে যায়।[১৭] রাত ১২টা ২০ মিনিটে এক বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সমুচিত জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আরেকটি চিঠি দেন। ৬ ডিসেম্বর লোকসভায় একটি বিবৃতি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী জানান, বাংলাদেশকে ভারত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, 'উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের বারবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু বিবেচনা করে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'[১৮] ইতিমধ্যে ভারতের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীন সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী গঠন করা হয় এবং জেনারেল অরোরাকে যৌথবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ওঠে। যুদ্ধবিরতির সব প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়।

জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে ১০ ডিসেম্বর এক বৈঠকে নিক্সনের বরাত দিয়ে কিসিঞ্জার বলেন, চীন যদি ভারতকে তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে এবং চীন যদি নিরাপত্তা চায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র চীনের ব্যাপারে অন্যদের নাক গলানোর বিরোধিতা করবে। আশু কর্তব্য হলো, পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ চালানো থেকে ভারতকে বিরত রাখা। যদি এ ব্যাপারে কিছু না করা হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান হবে ভুটান এবং পশ্চিম পাকিস্তান হবে নেপাল। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য নিয়ে ভারত অন্যান্য জায়গায় ইচ্ছেমতো তার শক্তি দেখানোর স্বাধীনতা পেয়ে যাবে।[১৯]

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ইয়াহিয়া খানের জিহাদি হুংকার-সংবলিত বিজ্ঞাপন

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্বাঞ্চলে অগ্রসরমাণ মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর মোকাবিলা করার সামর্থ্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল। জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আলোচনা করে জেনারেল রাও ফরমান আলী ঢাকায় জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরির কাছে ১০ ডিসেম্বর একটি লিখিত প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় :

ক) যেহেতু রাজনৈতিক কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, এটি রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে।

খ) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সব প্রতিনিধির কাছে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে একটি সরকার গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি।

গ) এই প্রস্তাবের সঙ্গে এটিও বলা দরকার যে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দাবি করছে ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যাবে।

ঘ) শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানিয়ে অনুরোধ করছি :

১) অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি;

২) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সসম্মানে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া;

৩) পাকিস্তানের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া;

৪) ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী সব মানুষের নিরাপত্তা;
৫) কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার নিশ্চয়তা;
ঙ) আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব;
চ) সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং এ প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা না হলে সেনাবাহিনীর শেষ সদস্যটিও জীবন থাকতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।[২০]

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট প্রস্তাবটি পেয়ে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিকে এর সত্যতা নিশ্চিত করতে বলেন। স্থায়ী প্রতিনিধি এ ব্যাপারে সরকারের নির্দেশনা চান। পররাষ্ট্রসচিব প্রস্তাবটি ইয়াহিয়ার কাছে নিয়ে গেলে তিনি প্রস্তাব থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পাকিস্তানি বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার অনুচ্ছেদ দুটি বাদ দিয়ে মহাসচিবের কাছে পাঠাতে বলেন।[২১]

নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো নিউইয়র্কে পৌঁছান ১১ ডিসেম্বর। তিনি ফরমান আলী ও ইয়াহিয়া এ দুজনের কারও প্রস্তাবই আমলে না নেওয়ার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করেন। ইয়াহিয়াকে পাঠানো এক বার্তায় ভুট্টো বলেন, 'আপনি জানেন যে আমি এ যুদ্ধের বিরোধী। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য প্রকাশ্যেই আমি এ কথা বলছি। কিন্তু আমরা যেহেতু এখন যুদ্ধের মধ্যে আছি, আপনার ভাষায় "ইসলামের সৈনিক" হিসেবে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব।'[২২]

নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম সদস্য পোল্যান্ড একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবটি ছিল: তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, সেনাবাহিনীকে পরস্পরের সীমান্তে ফিরিয়ে আনা এবং পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসা করা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ প্রস্তাবের কথা জানতে পারেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ওই সময় জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভুট্টো। তাঁকে খবর পাঠানো হলো, পোল্যান্ডের প্রস্তাব যেন গ্রহণ করা হয়। ইয়াহিয়া নিজে ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক যোগাযোগ করেও ভুট্টোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইয়াহিয়ার সঙ্গে তিনি আর যোগাযোগ করেননি। পোল্যান্ডের প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে ১০৫ ভোটে পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং পূর্ব ইউরোপীয় অন্য দেশগুলো প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। পোল্যান্ড সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের একটি দেশ হওয়ায় একটি আপসরফার ক্ষীণ সম্ভাবনা তখনো ছিল এবং প্রস্তাবটি গৃহীত হলে পাকিস্তানের মুখ রক্ষা হতো। কিন্তু ভুট্টোর সন্দেহজনক অনুপস্থিতির কারণে অনেক দেরি হয়ে যায় এবং প্রস্তাবটি তার কার্যকারিতা হারায়।[২৩]

ভুট্টো ইয়াহিয়াকে নিয়ে খেলছিলেন। ভুট্টো ভেবেছিলেন, যুদ্ধ যদি বেশি দিন চলে এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে যদি একটি মীমাংসা হয়, তাহলে তিনি এর কৃতিত্ব নেবেন। তিনি বলতে পারবেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি না হয়ে তিনি পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন। সামরিক কমান্ডাররা আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল এবং তিনি এটি ঠেকিয়েছেন। সেনাবাহিনী যদি পরাজয় মেনে নেয়, তাহলে তারা আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দলের নেতা হিসেবে তিনি (পশ্চিম) পাকিস্তানের ক্ষমতা হাতে নেবেন।[২৪]

কিসিঞ্জারের একটি বার্তা নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ১১ ডিসেম্বর পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের সঙ্গে দেখা করেন। বার্তায় লেখা ছিল, 'যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্ত ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তানের উভয় অংশে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি না হলে যুক্তরাষ্ট্র চুপচাপ বসে থাকবে না। ভারতকেও যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বলা হয়েছে।' বার্তায় আরও বলা হয়, সপ্তম নৌবহর রওনা হয়েছে। এটি পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা না-ও দেখা যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানে তেলের যে মজুত আছে, তা দিয়ে ভারতকে দু-তিন সপ্তাহের বেশি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরে এসে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে যোগ দেবে। সুতরাং পাকিস্তানকে আরও ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব পাকিস্তানকে আগলে রাখতে হবে এবং এ সময় নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তোলা যাবে না। এটি না হলে পাকিস্তানের দর-কষাকষির ক্ষমতা দারুণভাবে কমে যাবে।

কিসিঞ্জার তুরস্ক, ইরান, জর্ডান ও সৌদি আরবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, যাতে পাকিস্তানকে তারা বিমান ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে। সুলতান খান জানতে চান, সপ্তম নৌবহরের গন্তব্য কোথায় এবং তার কাজটা কী? ফারল্যান্ড জবাবে বলেন, নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে যাচ্ছে। তবে কী জন্য তা তিনি জানেন না। পরবর্তী ঘটনাক্রম দেখে বোঝা গেছে, এটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখানোর একটি প্রতীকী চেষ্টা। তবে এতে কোনো কাজ হয়নি। যাঁরা ওই সময় ওয়াশিংটনে ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস ও গণমাধ্যম ছিল বৈরী এবং যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী জনমত তখন তুঙ্গে। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে চায়। সুলতান খানের ভাষ্যমতে, 'আমি যখন ভোর চারটায় ইয়াহিয়ার ঘুম ভাঙিয়ে কিসিঞ্জারের বার্তাটি পড়ে শোনালাম, তিনি আমাকে তখনই গভর্নর মালেককে ফোন করে যেকোনো মূল্যে পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টা প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে বললেন। একই বার্তা জেনারেল নিয়াজি ও ফরমান আলীকে দেওয়া হলো।'[২৫]

১৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাত দুইটার সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইয়াহিয়াকে টেলিফোন করেন। নিক্সন ইয়াহিয়াকে আশ্বস্ত করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন বন্ধু মনে করে। তিনি আরও বলেন,

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (Pakistan)

16 December 1971

১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের দলিল

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সপ্তম নৌবহরকে অবিলম্বে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই প্রয়োজনের সময় পাকিস্তানের পাশে থাকবে। এটি শুনেই ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদকে বলেন, 'কাজ হয়ে গেছে, আমেরিকানরা রওনা হয়েছে।' পরবর্তী দিনগুলোতে পাকিস্তানিরা সপ্তম নৌবহরের আশায় দিন গুনছিল। কিন্তু তা আর কখনো আসেনি।[২৬]

১৪ ডিসেম্বর ভারতের বিমানবাহিনী ঢাকার গভর্নর হাউসে বোমা ফেলে। ভীতসন্ত্রস্ত গভর্নর আবদুল মোতালেব মালেক তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। এর আগেই এই হোটেলটিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি, সেনা প্রত্যাহার এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা শুরুর তাগিদ দিয়ে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একটি প্রস্তাব ছিল যুক্তরাষ্ট্রের, একটি ছিল যৌথভাবে বেলজিয়াম, ইতালি ও জাপানের এবং তৃতীয়টি ছিল আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম ও আরও সাতটি দেশের। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব প্রস্তাবেই ভেটো দেয়। ১৩ ডিসেম্বর তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ও নিজ নিজ সীমান্তে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার একটি প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র উত্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবারও ভেটো দেয়।

১৪ ডিসেম্বর পোল্যান্ড যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। অনুমান করা যায়, পোল্যান্ডের প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ছিল। প্রশ্ন হলো, পাকিস্তান কেন ওই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। রাজি হলে পাকিস্তানি বাহিনী লজ্জাজনক পরাজয়, আত্মসমর্পণ এবং যুদ্ধবন্দী হওয়ার গ্লানি থেকে রেহাই পেত। প্রস্তাবের প্রথম কয়টি অনুচ্ছেদ ছিল এ রকম :

ক) পূর্বাঞ্চলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, শেখ মুজিবকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দিতে হবে।

খ) ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই সব অঞ্চলে সামরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হবে এবং ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি শুরু হবে।

গ) যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্বাঞ্চল ছেড়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করবে।

ঘ) পশ্চিম পাকিস্তানি অসামরিক ব্যক্তি, যাঁরা বাড়ি ফিরে যেতে চান, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তাঁদের যাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। তাঁদের কোনো হয়রানি করা হবে না।

ঙ) ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব পাকিস্তানি সেনা সরে আসার জন্য সমবেত হলে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি বলবৎ হবে। পাকিস্তানি বাহিনী পূর্বাঞ্চল ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীও প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তবে তাদের প্রত্যাহারের

বিষয়টি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।

চ) ভারত ও পাকিস্তান তাদের দখলকৃত এলাকা ছেড়ে দেবে এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা শুরু করবে, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চিমাঞ্চলে এই নীতি বাস্তবায়িত হয়।[২৭]

জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা ভুট্টো এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ১৫ ডিসেম্বর পোল্যান্ড একটি সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করা হয়নি, যদিও এই প্রস্তাব আগেরটির চেয়ে আলাদা ছিল না। পাকিস্তান তখনো আশা করছিল, শেষ মুহূর্তে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে পাকিস্তানকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।[২৮]

১৫ ডিসেম্বর সংবাদ পাওয়া গেল, ঢাকায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের তোড়জোড় চলছে। ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদের সভায় এসে নাটক করলেন। জাতিসংঘকে 'ফার্স অ্যান্ড ফ্রড' বলে তিনি হাতের কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলেন এবং পরিষদের সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। পরে অবশ্য প্রচার করা হয়েছিল যে তিনি পোল্যান্ডের প্রস্তাব ছিঁড়ে ফেলেছেন।[২৯]

১৫ ডিসেম্বর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভারতীয় দুটি বিমান থেকে ঢাকায় প্রচারপত্র ছাড়া হয়। প্রচারপত্রে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সামরিক কমান্ডকে উদ্দেশ্য করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ১৬ ডিসেম্বর সকাল নয়টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজির সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন।

১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় বেলা সাড়ে তিনটার দিকে জেনারেল অরোরা একটি হেলিকপ্টারে করে সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলেছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৫ মিনিট দেরিতে। ভারতীয় সময় বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় ৫টা ২৫ মিনিট) নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।[৩০] মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম এ জি ওসমানী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। 'কেউ একজন নৈতিক ভুলটা করে বাংলাদেশ আর্মির সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ নষ্ট করেছিল।'[৩১]

পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানীর না থাকা নিয়ে পরে জল অনেক ঘোলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় সারদা পুলিশ

একাডেমির অধ্যক্ষ ছিলেন আবদুল খালেক (পরে পুলিশের মহাপরিদর্শক ও স্বরাষ্ট্রসচিব)। তিনি মুজিবনগর সরকারে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় :

> বিজয় যখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট, তখন আত্মসমর্পণ উৎসবে আমাদের যোগদান সম্পর্কে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাতে স্থির করা হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর কর্নেল ওসমানী, রুহুল কুদ্দুস ও আমি হেলিকপ্টারে ভারতীয় কমান্ডারকে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছাব। দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছার জন্য আমাদের যে সময় দেওয়া হয়েছিল, তার ঘণ্টা খানেক আগে আমাদের প্রশাসনে কী যেন একটি হাশ হাশ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমি তার কিছুই আঁচ করতে পারিনি। রুহুল কুদ্দুস শুধু জানালেন যে কর্নেল ওসমানীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চিফ এ কে খন্দকারকে খুঁজে বের করা হয়েছে। শুধু তিনি ঢাকায় যাবেন। আমরা দুজন যাব না। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে কার কী মতভেদ ঘটেছিল তা আর জানতে পারিনি।[৩২]

১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ইন্দিরা গান্ধী সুইডেনের একটি টেলিভিশনের কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন। এমন সময় জেনারেল মানেকশ তাঁকে টেলিফোনে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরটি দেন। ইন্দিরা দ্রুত চলে যান লোকসভায়। অধিবেশনকক্ষে তখন উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা। এক লিখিত বিবৃতিতে ইন্দিরা বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী।[৩৩]

**Over 30 lakh killed by Pak forces —Pravda**

MOSCOW, Jan. 4 (ENA): The Communist Party newspaper Pravda has reported that over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistan occupation forces during the last nine months.

Said, Atiqur Rahman, Farhad Rahman, Rehana Akhtar, Mahbuba Haider and others.

**Observance of 'Mujib Day' discussed**

A meeting of the Presidents and Secretaries of the Union Awami League units under

মস্কো থেকে প্রকাশিত *প্রাভদায়* ছাপা সংবাদের সূত্র ধরে ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ বার্তা সংস্থা 'এনা' পরিবেশিত খবর : পাকিস্তানিরা ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে

যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের দপ্তরের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, তাদের ৩৫৪ জন কমিশন্ড অফিসার, ১৯২ জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং ৫ হাজার ৩২০ জন সাধারণ সেনা নিহত হয়েছিল।[৩৪] আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৪ হাজার ১৫৪ জন, নৌবাহিনীর ১ হাজার ৩৮১ জন, বিমানবাহিনীর ৮৩৩ জন, আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশের ২২ হাজার সদস্য, ১২ হাজার অসামরিক ব্যক্তিসহ মোট ৯০ হাজার ৩৬৮ জন যুদ্ধবন্দীকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৩৫]

যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভারতীয় কমিশন্ড অফিসারদের মধ্যে ৬৮ জন নিহত এবং ২১১ জন আহত হন। জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ১৬০, তিনজন নিখোঁজ হয়েছিলেন। এনসিওদের মধ্যে ৩ জন নিহত ও ১১ জন আহত হয়েছিলেন। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে ১ হাজার ২৯০ জন নিহত, ৩ হাজার ৬৭৬ জন আহত এবং ৬৩ জন নিখোঁজ হয়েছিলেন। মোট নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ৪২১ জন এবং আহত হয়েছিলেন ৪ হাজার ৫৮ জন।[৩৬]

যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কতজন প্রাণ দিয়েছিলেন, তার সঠিক সংখ্যাটি এখনো অজানা। তবে নিয়মিত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের হিসাব পাওয়া যায়। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ১ হাজার ৬০৮ জন যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অফিসার ছিলেন ৪৯ জন, জেসিও ৭৮ জন এবং অন্যান্য পদের সৈনিক ১ হাজার ৪৮১ জন। তাঁদের অনেকেই ২৫ মার্চ রাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং আটক অবস্থায় তাঁদের হত্যা করা হয়।[৩৭] এ ছাড়া পুলিশ বাহিনীর ১ হাজার ২৬২ জন সদস্য যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন।[৩৮] 'যুদ্ধে নিহত ইপিআরের বাঙালি সদস্যদের সংখ্যা ৮১৭।'[৩৯]

৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর মাত্র ১০-১২ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে ফেলে। এত দ্রুত এই পর্ব শেষ হওয়াটি ছিল বিস্ময়কর। মাত্র ১২ দিনের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে এবং ভারতই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে—এমন একটা প্রচার আছে। এটা সত্যের অপলাপ।

ডিসেম্বরের শুরুতে বিজয়ের শর্তগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন এ দেশের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। ভারতের পূর্বাঞ্চলের চিফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকবের মূল্যায়ন হলো :

> বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও গেরিলাযোদ্ধারা এ ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁরা শত্রুকে হারাতে

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। দেশের ভেতরে বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে এবং শত্রুকে নানাভাবে হয়রানি করে তাঁরা জয়ের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছিলেন; তাদের মনোবল এমন পর্যায়ে নেমে এসেছিল যে, বৈরী পরিবেশে তাদের সামর্থ্য তলানিতে ঠেকেছিল। তারা নিজ নিজ অবস্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মুক্তিবাহিনী ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অর্জন ছিল বিশাল। বাংলাদেশ তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে। একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে তাদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অবশ্যই তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে।[৪০]

ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দেশটির ধর্মরাষ্ট্র হিসেবে প্রচারের ভিত্তিটা ধসে পড়ল বলে অনেকেই মনে করেন। পি এন হাকসারের মন্তব্য ছিল, হিন্দু আর মুসলমান যে দুটি আলাদা জাতি—এই প্রচার ছিল মানুষের তৈরি একটি নির্ভেজাল কেচ্ছা।[৪১] পাকিস্তানের নির্বাসিত লেখক-সাংবাদিক তারিক আলী পরে মন্তব্য করেছিলেন, উত্তর প্রদেশের মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায় জন্ম নেওয়া দ্বিজাতিতত্ত্বকে বাংলার গ্রামে দাফন করা হয়েছে।[৪২]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নয় মাসে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীরা এ দেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। কতজন যে যুদ্ধ ও গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তার সঠিক হিসাব কোনো দিনই বের করা সম্ভব হবে না। মস্কো থেকে প্রকাশিত দৈনিক *প্রাভদা* পত্রিকায় নিহত মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। সংখ্যাটি উদ্ধৃত করে *বাংলাদেশ অবজারভার* ৫ জানুয়ারি (১৯৭২) একটি সংবাদ ছেপেছিল। পাকিস্তান অবশ্য সব সময় সংখ্যাটি অনেক কম দেখিয়ে নিজেদের অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছে, পাকিস্তান সরকার সব সময় তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য পাকিস্তান সরকার ২৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে প্রধান করে লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুর রহমানকে এই কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। কমিশন ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তথ্য জোগাড় করতে শুরু করে এবং ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত তা চালু থাকে। কমিশন মোট ২১৩ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সাক্ষাৎকারে দেওয়া তাঁদের কারও কারও বক্তব্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংসতার আংশিক ছবি ফুটে উঠেছে। তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ, জিওসি সপ্তদশ ডিভিশন, স্বীকার করেছেন, 'প্রচার ছিল যে অনেক বাঙালিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে।'

৯৩-ক ব্রিগেডের কমান্ডার এবং ঢাকার দায়িত্বে নিয়োজিত আইএসআইয়ের স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান স্বীকার করেছেন, 'অনেক ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলে আনা হয়েছিল।'

লে. কর্নেল এস এম এইচ বোখারি বলেছেন, 'রংপুরে দুজন অফিসার ও ৩০ জন সেনাকে কোনো বিচার ছাড়াই খতম করা হয়েছে।' ৩৯ নম্বর বালুচ রেজিমেন্টের লে. কর্নেল এস এম নাঈমের ভাষ্য হলো, 'আমাদের অভিযানে নিরপরাধ মানুষ মারা গেছে এবং এর ফলে জনগণ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।' ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের লে. কর্নেল ইয়াকুবের নির্দেশে ১৭ জন বাঙালি অফিসার ও ৯১৫ জন সেনাকে হত্যা করা হয়েছে। ৮ বালুচ রেজিমেন্টের লে. কর্নেল আজিজ আহমদ খান বলেছেন, 'ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুরে সব ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি যত দূর সম্ভব এই আদেশ পালন করেছি। নিয়াজি ঠাকুরগাঁও ও বগুড়ায় আমার লোকদের দেখতে এসেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কতজন হিন্দুকে মারা হয়েছে? মে মাসে লিখিত নির্দেশ এসেছিল, সব হিন্দুকে হত্যা করতে হবে। ২৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[৪৩]

কমিশনের রিপোর্টে 'শৃঙ্খলা'বিষয়ক ২৮ নম্বর পরিচ্ছেদে বলা হয়, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা কিছু করেছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে তার অনেক সমালোচনা হয়েছে। অভিযোগ আছে যে সেনাবাহিনী অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে, অফিসার ও সেনারা যথেচ্ছ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ করেছে। সেনারা ব্যাংক, দোকান এমনকি বাড়িঘরে ঢুকেও লুটতরাজ করেছে। অনেক জনপদ নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অসহায় নারীদের জোর করে ধরে এনে ধর্ষণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরে যাওয়া অসামরিক লোকেরাই শুধু এই অভিযোগ করেনি, সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তাও এসব কাজে অংশ নিয়েছে বলে জানিয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, সেনাসদর এবং পূর্বাঞ্চলের সামরিক কমান্ড থেকে বারবার বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। কারণ, অপরাধীরা ধরা পড়ার পরও শাস্তি পায়নি। অভিযোগ আছে যে সার্বিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার প্রধান কারণ হলো সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাদের আচরণ সেনাদের চেয়ে কোনো অংশেই ভালো ছিল না। লুটপাট ও ধর্ষণের অভিযোগের কিছু তদন্ত হয়েছিল,

কিন্তু মনে হয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এসব অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং এটি বলা যাবে না যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্মান নষ্ট করার জন্য এসব অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঢাকার কর্তৃপক্ষ বলছে, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ৩০ লাখ লোককে হত্যা করেছে। ইয়াহিয়ার প্রশাসন এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য দেয়নি। সেনাসদর থেকে জানানো হয়েছে, আনুমানিক ২৬ হাজার মানুষ সেনা অভিযানে মারা গেছে। সেনা আক্রমণে ঠিক কতজন নিহত হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যাটি বের করা দরকার, অন্যান্য নৃশংসতার তথ্যও জানানো প্রয়োজন। এ জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত বা তদন্ত কমিশন গঠন করা দরকার। এই কমিশন এসব অভিযোগের তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে। যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বদনামের কারণ হয়েছে এবং যাদের নিষ্ঠুরতার কারণে জনগণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের প্রাপ্য সাজা দিতে হবে। তদন্ত আদালতের গঠনপ্রক্রিয়া জনগণকে জানাতে হবে, যেন দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হয়।[৪৪]

একাত্তরের নয় মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হয়েছেন ১৫২ জন। এর মধ্যে ২০ জন শিক্ষক, ১০২ জন ছাত্র এবং ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী।[৪৫] দরিদ্র সাধারণ মানুষই নিহত হয়েছেন বেশি। শহীদের মধ্যেও শ্রেণিবিভক্তি হয়েছে। কেউ কেউ তারকাখ্যাতি পেয়েছেন। অন্যরা অপাঙ্‌ক্তেয় রয়ে গেছেন। শহীদ এখন একটি সংখ্যাবাচক শব্দ। তাঁদের নামের কোনো পরিপূর্ণ তালিকা নেই। মানুষ মারতে গিয়ে একজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। তাকে চিকিৎসার জন্য রাওয়ালপিন্ডির সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সে ছিল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সে একাই ১৪ হাজার মানুষ মেরেছে। একটি দুঃস্বপ্ন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।[৪৬]

এ যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অনেক সদস্য হতাহত হয়েছিলেন। ২৭ ডিসেম্বর (১৯৭১) যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসিকে এক সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় একজন সাংবাদিক ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধে আপনার দেশ অনেক মূল্য দিয়েছে। বিনিময়ে ভারত কী পেয়েছে?' এ প্রশ্নের জবাব ইন্দিরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসা রালফ চ্যাপলিনের একটি কবিতার চার লাইন উদ্ধৃত করে বলেন :

> মোর্ন নট দ্য ডেড
> বাট র‍্যাদার মোর্ন দ্য প্যাথেটিক থ্রং
> হু সি দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেট অ্যাংগুইশ অ্যান্ড ইটস রং
> বাট ডেয়ার নট স্পিক

(মৃতের জন্য কেঁদো না
বরং জমে থাকা ভুলের জন্য কাঁদো
জগতের সব দুঃখ আর অন্যায় দেখেও
কেন প্রতিবাদ করে না কেউ)

তিনি আরও বলেন, 'আমরা মনে করি, ভারত কথা বলেছে কেবল বাংলাদেশের মানুষের জন্য। ভারতের জন্য নয় শুধু, দুনিয়ার সব নির্যাতিত মানুষের জন্য।...আমি আশা করব, মার্কিন প্রশাসন রাগ ভুলে সবকিছু নতুন করে দেখবে।'[৪৭]

১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ডি পি ধরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই শেখ মুজিব জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত হস্তক্ষেপ করেনি কেন? এটি করলে কম ভুগতে হতো এবং অনেক জীবন বেঁচে যেত।'[৪৮]

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বিয়োগান্ত হয়। অনেক রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্ম। বাইরের দুনিয়ায় দ্বিজাতিতত্ত্বের বেলুনটা ফুটো হয়ে গেলেও বাংলাদেশের ভেতরে বড় একটি জনগোষ্ঠীর মনের মধ্যে এই তত্ত্বের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। একাত্তরে আগুনটা সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল। ক্রমেই তার শিখাটা লকলকে জিহ্বা বের করতে থাকে। অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে দেখা যায়, বাংলাদেশ আবারও ১৯৪০-এর দশকের ধর্মীয় জাতীয়তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। লেখক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের ভাষ্য হলো :

প্রকৃত অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাঙে নাই, 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাবমতো দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছে। তারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণ দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোনো কারণ নাই।[৪৯]

যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়ের পর ইয়াহিয়ার পক্ষে আর ক্ষমতায় থাকা সম্ভব ছিল না। সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য বিদ্রোহের মুখে তিনি অসামরিক কর্তৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ভুট্টো তখন রোমে ছিলেন। তাঁকে আনার জন্য একটি বিশেষ বিমান পাঠানো হয়। ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইয়াহিয়াকে অন্তরীণ এবং সাতজন জেনারেলকে বরখাস্তের নির্দেশ

দেন। শেখ মুজিবকে ২৬ ডিসেম্বর জেল থেকে প্রথমে একটি অতিথিশালায় নেওয়া হয়। এক রাত সেখানে থাকার পর তাঁকে রাওয়ালপিন্ডির সিহালা গেস্টহাউসে স্থানান্তর করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। মুজিব তখনো জানতেন না, ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ভুট্টো মুজিবকে জানালেন, এখন তিনিই প্রেসিডেন্ট। ইয়াহিয়া মুজিবের ফাঁসি চেয়েছিলেন, তিনিই (ভুট্টো) এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

মুজিব : আমি সুখী। আমাকে বাংলাদেশের অবস্থা বলুন। আমি খুবই উত্তেজিত।

ভুট্টো : সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজের সহযোগিতায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকা দখল করেছে।

মুজিব : তার মানে, ওরা আমাদের মেরে ফেলেছে? আমার ঢাকায় যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আপনাকে কথা দিতে হবে, ভারতীয়রা যদি আমাকে জেলে পাঠায়, আমি আপনার সাহায্য পাব। আপনাকে আমার জন্য লড়তে হবে।

ভুট্টো : মুজিব, আমাদের একসঙ্গে লড়াই করতে হবে।

মুজিব : না, না, আমাকে সবকিছু ঠিক করতে হবে। আমি নিশ্চিত, সেখানে দখলদার বাহিনী আছে। আওয়ামী লীগ তাদের হটাতে পারবে না। আমি আপনার সাহায্য চাই। বিশ্বাস করুন, আমি কখনো ভারতীয়দের চাইনি। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?

ভুট্টো : আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। তা না হলে আমি কি এ কাজ করতাম? প্রথমেই আমি জেল থেকে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করেছি এবং তারপর এখানে এনেছি। আইয়ুবের সময় আমিও একই জেলে, একই সেলে বন্দী ছিলাম।

মুজিব : আপনি কি মিলিটারিকে সরিয়ে দিয়েছেন?

ভুট্টো : এটি আর কোনো বিষয় নয়। মিলিটারি আর ফিরে আসবে না। আমি এখন পাকিস্তানের ঐক্য চাই, আপনার দেওয়া যেকোনো শর্তে। আপনি যদি প্রেসিডেন্ট হতে চান, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আপনি ইচ্ছা করলে প্রধানমন্ত্রীও হতে পারেন। অথবা আপনার অনুমোদন নিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারি। প্রতিটি অংশের যার যার মতো সংবিধান তৈরির স্বাধীনতা থাকবে, যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন। খোদা কি লিয়ে পাকিস্তানকো কিসি তারে বাঁচাও। (আল্লাহর ওয়াস্তে যেভাবেই হোক পাকিস্তানকে বাঁচাও)

মুজিব : ইয়ার মুঝে জানে তো দো না (বন্ধু, আমাকে তো আগে যেতে দাও)?

ভুট্টো : মুজিব ভাই, আমাদের একত্রে থাকার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

মুজিব : আমি আমার লোকদের সঙ্গে দেখা করব, তাদের সঙ্গে আলাপ করে আপনাকে জানাব। আমি কথা দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আমরা একটা কিছু করব। এ ব্যাপারে আমি এখনই কথা দিতে পারছি না। আপনি আমার অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করুন।[৫০]

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খানের মতে, ভুট্টোকে মুজিব এসব কথা বলেছিলেন তাঁকে খুশি করার জন্য, তাঁর নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্য। তাঁর সন্দেহ ছিল, তাঁকে আটকে রাখার জন্য নানান ছুতো তৈরি করা হতে পারে।[৫১]

বিচার চলাকালে শেখ মুজিব জানতে পেরেছিলেন, কামাল হোসেন পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কারাগারে আছেন। তিনি ভুট্টোকে অনুরোধ করলেন কামাল হোসেনকে যেন এই গেস্টহাউসে নিয়ে আসা হয়। পরদিন কামাল হোসেনকে হরিপুর জেল থেকে মুক্তি দিয়ে এই গেস্টহাউসে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের রেডিও ও সংবাদপত্র সরবরাহ করা হয়।

আজিজ আহমদকে ভুট্টো পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। আজিজ আহমদ শেখ মুজিবের ঢাকায় যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করতে এলেন। শেখ মুজিব অনুরোধ করলেন, জাতিসংঘ বা রেডক্রসের একটি বিমানে করে যেন তাঁকে পাঠানো হয়। আজিজ আহমদ জানালেন, এটি সম্ভব নয়। তাঁকে পিআইএর একটি বিমানে পাঠানো হবে। কিন্তু যেহেতু ভারতের ওপর দিয়ে বিমান যেতে পারবে না, তাই তাঁকে তেহরানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখান থেকে অন্য একটি বিমানে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হবে। শেষে ঠিক হয়, তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরীকে ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। দু-তিন দিন পর কামাল হোসেনের পরিবারকে করাচি থেকে ইসলামাবাদে নিয়ে আসা হলো।[৫২]

৭ জানুয়ারি রাতে রওনা হওয়ার আগে ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে আবার দেখা করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর শেখ মুজিব ও কামাল হোসেনের জন্য পাকিস্তানি কূটনৈতিক পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে। এ জন্য পররাষ্ট্র দপ্তর রাত অবধি খোলা রাখা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বিরজিস হাসান খানের স্বাক্ষরিত পাসপোর্ট নিয়ে তাঁরা তৈরি হলেন লন্ডনে যাওয়ার জন্য। বিমানবন্দরে ভুট্টো মুজিবকে ২৭ ডিসেম্বরের আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, 'আপনি বলেছিলেন, আমরা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা—এর দুটি বা তিনটি জিনিস একত্রে রাখতে পারি। যত হালকা হোক, কনফেডারেশনে আমার আপত্তি নেই।' মুজিব আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'না, না আমি আপনাকে আগেই বলেছি, অপেক্ষা করুন, আমরা একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারব। এটি আপনার আর আমার মধ্যকার একান্ত বিষয়। আশা করি, আপনি এ কথা কাউকে বলেননি।' ভুট্টো

কথা দিলেন, তিনি বিষয়টি পুরোপুরি গোপন রাখবেন। ভুট্টো বললেন, মিটমাট করার জন্য প্রয়োজনে তিনি ঢাকায় যেতে রাজি। জবাবে মুজিব বললেন, 'না, না আমি আমার লোকদের সঙ্গে দেখা করব। আমি সময় চাই। আমি পরে জানাব।' ভুট্টো শেখ মুজিবের হাতে ৫০ হাজার ডলারের একটি তোড়া দিয়ে বললেন, 'এটা আপনার খরচের জন্য।' মুজিব তা নিতে অস্বীকার করে বলেন, 'এটি বিমান চার্টার করার খরচ হিসেবে রেখে দিন।'[৫৩]

ভুট্টো ও মুজিব পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। পিআইএর বিশেষ বিমানটি শেখ মুজিব, কামাল হোসেন ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে ৭ জানুয়ারি মাঝরাতে রওনা হলো। ভুট্টো স্বগতোক্তি করলেন, 'পাখি উড়ে গেছে।' পরদিন ভোর সাড়ে ছয়টায় বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছায়। শেখ মুজিব বিমান থেকে মুক্ত মানুষ হিসেবে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল, যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য একদিন তিনি লড়াই করেছিলেন।[৫৪]

পাকিস্তানের এই বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য কে কতটা দায়ী, তা নিয়ে পাকিস্তানে অনেক বছর ধরেই একাডেমিক আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশে এটি এখনো শুরু হয়নি। হয়তো সেই পরিবেশ নেই। মুজিব, ভুট্টো, ইয়াহিয়া তিনজনই জানতেন, পাকিস্তান ভাঙছে। শেখ মুজিবের হারানোর কিছু ছিল না। পাকিস্তান থাকলে তিনিই সরকার চালাবেন, পাকিস্তান ভাঙলে বাংলাদেশ তাঁরই থাকবে। কেননা তিনি তখন বাঙালির একচ্ছত্র নেতা। সাধারণ মানুষ তাঁর পেছনে এককাট্টা।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে ইয়াহিয়ার সংকটটা অন্য রকম। সেনাবাহিনী চলবে কী করে। শেখ মুজিব যে ফর্মুলা দিয়েছেন, তাতে করে কেন্দ্রীয় সরকারকে চলতে হবে প্রদেশগুলো থেকে পাওয়া চাঁদার টাকায়। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী রীতিমতো একটি শ্বেতহস্তী। ইয়াহিয়ার পক্ষে এটি কোনো রকমেই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

পাকিস্তানের ঐক্য নিয়ে ভুট্টোর মাথাব্যথা ছিল না। বরং পাকিস্তান ভাঙলেই তাঁর সুবিধা। পাকিস্তান এক থাকলে তাঁকে আজীবন বিরোধী দলের বেঞ্চেই বসতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালিপ্সু ভুট্টোর পক্ষে এটি হজম করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই দুই গণপরিষদের পক্ষে তিনি সাফাই গেয়েছিলেন। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে ছিল তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর দল শতকরা ৪০ ভাগ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের একক প্রতিনিধির মতো হুংকার দিতে থাকলেন। এখানেও ভুট্টোর সমস্যা ছিল।

বাংলাদেশ আলাদা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানকে যে তিনি পকেটে পুরতে পারবেন, তার নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি ভালো করেই জানতেন, পশ্চিমে তাঁর

অবস্থান নিরঙ্কুশ নয়। সেনাবাহিনী সেখানে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী। সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করেই তাঁকে চলতে হবে। সুতরাং তাঁর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াল ইয়াহিয়া ও সশস্ত্র বাহিনী। ইয়াহিয়া সরে গেলেও সেনাবাহিনী থেকে যাবে। আরেকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেনারেল তখন তাঁর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলবে। সুতরাং ভুট্টো এক ঢিলে দুই পাখি মারার ফন্দি আঁটলেন। তাঁর চিন্তা হলো, পাকিস্তানকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যাতে ইয়াহিয়াকে সরে যেতে হয় এবং মানুষ সেনাবাহিনীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়, মুখ ফিরিয়ে নেয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পোল্যান্ডের প্রস্তাব আলোচনার সময় তাঁর সন্দেহজনক অনুপস্থিতি ঢাকা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর মানসম্মান নিয়ে ফিরে আসার শেষ সম্ভাবনাটুকু মুছে দেয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে ইয়াহিয়া এবং তাঁর সেনাবাহিনী প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়ে। ভুট্টোর জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। তিনি ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। সেনাবাহিনীর মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে, আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাদের কোমর ভেঙে দিয়ে ভুট্টো যে 'অপরাধ' করেছিলেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তা কখনোই ক্ষমা করেনি। প্রতিশোধ নিতে সেনাবাহিনীর সময় লেগেছিল আট বছর। একটি সাজানো মামলায় তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয়েছিল।

পাকিস্তানে স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি সরল পাঠ আছে, যেখানে বলা হয়েছে: পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ না বুঝে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরোধিতা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে দেশের প্রতি কোনো আনুগত্য ছিল না। দেশের ভেতরে অনেক শত্রু ছিল, যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। ভারত তার এজেন্টদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা বাধায়। অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারত চারদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে যায়। এই বক্তব্যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে যে সাফাই গাওয়া হয়েছে, তা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।[৫৫] বাংলাদেশ 'হাতছাড়া' হয়ে যাওয়ার ক্ষত দগদগে ঘা হয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনোবেদনার কারণ হয়ে থাকবে দীর্ঘকাল।

দুই দশকের একটানা রাজনৈতিক লড়াইয়ের শেষ লগ্নে এসে একটি রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তানি বাহিনীর ঢাকায় আত্মসমর্পণের ফলে বাঙালি এক বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু তখনো বন্দী। তাঁর মুক্ত হয়ে লন্ডনে পৌঁছানোর

খবর শোনা মাত্রই বাংলাদেশের সব মানুষ আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায়। মনে হলো, স্বাধীনতার স্বাদ বুঝি পাওয়া গেল পুরোপুরি, যা মুজিবের অনুপস্থিতিতে ছিল অপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখনো একটি ঘোরের মধ্যে। হিথরো বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ-বিষয়ক দপ্তরের কর্মকর্তা আয়ান সাদারল্যান্ড। এখন তিনি কোথায় যাবেন? রাসেল স্কয়ারে একটি হোটেলের কথা তাঁর মনে পড়ল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁকে বলা হলো, বনেদি ক্ল্যারিজ হোটেলেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শেখ মুজিব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ তো অনেক টাকার ধাক্কা, কোথায় পাব আমি?' তাঁকে বলা হলো, রাষ্ট্রপ্রধানদের থাকার উপযোগী হাতে গোনা হোটেলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। ইয়াহিয়া খান ও ইন্দিরা গান্ধী লন্ডনে এসে এখানেই থেকেছেন। হোটেলে যাওয়ার পথে তিনি লন্ডনে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত মিশনপ্রধান রেজাউল করিমের কাছে শুনতে থাকেন, কী ঘটে গেছে এই দিনগুলোতে। বন্দী থাকা অবস্থায় অনেক কিছুই ছিল তাঁর অজানা। রেজাউল করিমের কাছে সব শুনে তিনি অবাক বিস্ময়ে শুধু বলতে পারলেন, 'আমরা সত্যি স্বাধীন হয়েছি!'[৫৬]

যে দেশটি স্বাধীন করার জন্য তিনি এতগুলো বছর খেটেছেন, জীবনের সোনালি সময়টা হারিয়েছেন চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী অবস্থায়, সেই দেশটি

বীরের প্রত্যাবর্তন

আজ স্বাধীন হয়েছে। এটি ছিল তাঁর জন্য এক পরম প্রাপ্তি। তিনি দেশে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন। কূটনৈতিক স্বীকৃতি না দেওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে স্বাগত জানান। মাত্র ২৬ ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। যুক্তরাজ্য বিমানবাহিনীর একটি বিমানে চড়ে তিনি উড়াল দিলেন ঢাকার পথে। মাঝখানে দিল্লিতে কয়েক ঘণ্টার বিরতি। অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পেলেন দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। তারপর ঘরে ফেরা।

১০ জানুয়ারি বেলা আড়াইটায় ঝকঝকে রোদ্দুরের মধ্যে কমেট বিমানের চাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করল। বিমানটি ঘিরে উপচে পড়া ভিড়। সেখান থেকে তাঁকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, যেখানে অপেক্ষায় ছিলেন লাখ লাখ মানুষ। মাঠে কোনো মঞ্চ ছিল না। একটি ডজ ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীন দেশে মুক্ত মানুষ হিসেবে তিনি উচ্চারণ করলেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের কথা। পাকিস্তানের উদ্দেশে বার্তা দিলেন, 'তোমরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছ, মা-বোনদের বেইজ্জত করেছ, অগুনতি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছ, এক কোটি লোককে ভিটেছাড়া করে ভারতে যেতে বাধ্য করেছ; তার পরও মনের মধ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রাখতে চাই না। তোমরা স্বাধীন থাকো, আমাদের স্বাধীনভাবে থাকতে দাও। তোমাদের সঙ্গে সব চুকেবুকে গেছে।'[৫৭]

ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের ওপর পর্দা নামল। শেষ হলো ২৪ বছরের দুঃস্বপ্নের প্রহর। একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জেগে উঠল নতুন এক দেশ, বাংলাদেশ।

# উপসংহার

অনেকের কাছে ১৯৭১ নিছক একটি যুদ্ধ কিংবা রাজনীতির পালাবদলের বছর। কিন্তু এই যুদ্ধ একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এর একটা বিস্তৃত পটভূমি আছে। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে আছে নানা আলোচনা। কে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, কবে দিলেন, কিংবা আদৌ ঘোষণা দিলেন কি না, তা নিয়ে তর্কটা জরুরি নয়। এটি ছিল একটি জনগোষ্ঠীর জেগে ওঠার গল্প, এক মহাজাগরণ। ইতিহাসের নানা পর্বে এ দেশের মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এই উত্তাসনের সিঁড়ি একটি একটি করে নির্মাণ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের কথা আলোচনা করতে গেলে অবধারিতভাবে চলে আসে আওয়ামী লীগ এবং এর প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। একজন ব্যক্তি, একটি দল এবং একটি দেশের মানুষ যখন এক মোহনায় মিশে যায়, তখন তাদের আলাদা করে দেখা কঠিন।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি মানুষ পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। তাদের পরিচিতি ছিল 'ইসলামপসন্দ পার্টি' হিসেবে। তাদের কাঁধে ভর দিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি টিকে থাকার শেষ চেষ্টা করেছিল।

আওয়ামী লীগ একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এবং সাফল্যের কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতীক ও প্রতিভূ। এটিই হলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনিবার্য অনুষঙ্গ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় দলটি নতুন করে সংকটে পড়ে।

স্বাধীনতার পক্ষে জনমানুষের আবেগ ছিল সীমাহীন, আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশছোঁয়া, অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বঙ্গবন্ধু জাতিরাষ্ট্রের ভিত তৈরি করেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের মধ্যে একতা ও সংহতির বাঁধনটা দুর্বল হয়ে যায়। প্রথম সারির নেতারা একেকজন একেক জায়গায় চলে

যান। তাঁদের সামনে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপকল্প ছিল না। তাঁদের জড়ো করে একটা অস্থায়ী সরকার তৈরি করতে বেশ সমস্যা হয়েছিল।

এপ্রিলে প্রবাসী সরকার তৈরি হলেও তার মধ্যে ছিল নানা রকম দ্বন্দ্ব ও জটিলতা। অন্যান্য রাজনৈতিক দল, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারদের সঙ্গেও সরকারের সমন্বয়টা ভালো ছিল না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা, জড়িয়ে পড়েছিলেন বিতর্কে। তার পরও পরিস্থিতি অনেকটা সামাল দেওয়া গেছে তাজউদ্দীন আহমদের আপসহীন ভূমিকায় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কুশলী নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই পরাশক্তির ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশকে নিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জোরালো সমর্থন পেয়ে ভারত তা সামাল দিতে পেরেছিল। জাতীয় স্বাধীনতার সশস্ত্র পর্বে ভারত পালন করেছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তার পরও নির্দ্বিধায় বলা যায়, ১৯৪৯ সালে জন্ম নেওয়া আওয়ামী লীগের ২২ বছরের রাজনীতির প্রধান অর্জন কী, এই প্রশ্নের উত্তর হলো—বাংলাদেশ। তবে এই অর্জনের পেছনে আছে কোটি কোটি মানুষের মেধা, ঘাম ও রক্ত। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লাখ লাখ মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধের মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ।

# পরিশিষ্ট

## পরিশিষ্ট ১

# কলকাতার মার্কিন কনস্যুলেট থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে ওয়াশিংটনে পাঠানো টেলিগ্রাম

POL 27 India-PAK

Department of State TELEGRAM

SECRET ACTION COPY

CONTROL: 7826Q
RECD: 29 SEP 10 53Z

NODIS REVIEW
Cat. A - Caption removed; transferred to O/FADRC
Cat. B - Transferred to O/FADRC with additional access controlled by S/S
Cat. C - Caption and custody retained by S/S
Reviewed by: Ambassador W. Witman, II
Date: 1975

O 290902Z SEP 71
FM AMCONSUL CALCUTTA
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 2282
BT
S E C R E T SECTION 1 OF 3 CALCUTTA 2575
NODIS

DEPT PLEASE PASS NEW DELHI ISLAMABAD DACCA

SUBJECT: CONTACT WITH BANGLADESH REPS - MEETING WITH MUSHTAQ

REFERENCE: CALCUTTA 2570

1. SUMMARY: CONGEN POLITICAL OFFICER HELD 90 MINUTE DISCUSSION WITH BD "FONMIN" MUSHTAQ AHMED SEPTEMBER 28. MUSHTAQ PLACED BLAME FOR EVENTS IN EAST PAKISTAN SINCE MARCH 25 SQUARELY ON USG BECAUSE OF ITS CONTINUED SUPPORT OF GOP. HE NONETHELESS SAID IT FERVENT DESIRE OF BDG TO REGAIN CLOSE FRIENDSHIP WITH UNITED STATES. HE HOPED USG WOULD FIND IT IN ITS OWN INTERESTS TO HELP ARRANGE FOR PEACEFUL INDEPENDENCE FOR BANGLADESH. HE WARNED THAT TIME IS RUNNING OUT FOR USG TO STEP IN AND HELP AVOID LEFTIST TAKEOVER OF BD. HE HAD NO DESIRE TO TALK DIRECTLY TO GOP BUT REQUESTED USG TO SPEAK TO GOP ON BEHALF OF BDG. HE ASKED FOR OFFICIAL RESPONSE TO HIS REQUESTS AS SOON AS POSSIBLE. HE EXPRESSED DESIRE TO DISCREETLY MAINTAIN DIRECT CHANNEL WITH POLOFF AND SAID HE ASSUMED THERE WOULD BE NO OTHER CHANNEL. HE ADDED HE HAD NOT AUTHORIZED ANY OTHER CHANNEL HIMSELF, ALTHOUGH HE KNEW OTHER WELL-INTENTIONED BD LEADERS HAD AND MIGHT IN FUTURE CONTACT USG REPS IN EFFORT DETERMINE "MIND OF AMERICANS." END SUMMARY.

2. POLOFF RECEIVED URGENT CALL FROM BD "HIGH COMMISSIONER" HOSSAIN ALI SEPTEMBER 28, WHO ASKED IF POLOFF WISHED TO TALK TO BD "FONMIN" MUSHTAQ AHMED. POLOFF RESPONED THAT HE WOULD BE AGREEABLE TO DO SO IF MUSHTAQ WISHED TO TALK TO HIM. ALI SAID MUSHTAQ DID, AND SCHEDULED EVENING APPOINTMENT AT BD "HIGH COMMISSIONER" POLOFF WAS MET BY ALI, WHOM HE HAD KNOWN PREVIOUSLY, AND INTRODUCED TO MUSHTAQ, WHO ARRIVED ABOUT FIVE MINUTES AFTER POLOFF. ALI THEN LEFT MUSHTAQ AND POLOFF ALONE FOR

SECRET

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

NODIS NODIS NODIS

*Department of State* **TELEGRAM**

SECRET

-2- S E C R E T SECTION 1 OF 3 CALCUTTA 2575, NODIS, SEP 29

HOUR'S PRIVATE DISCUSSION OUTLINED BELOW, AND REJOINED FOR LAST THIRTY MINUTES.

3. MUSHTAQ OPENED CONVERSATION BY ASKING POLOFF FOR PRECISE OUTLINE OF USG POLICY VIS-A-VIS BD, AND WOUND UP BY ASKING, "WHY ARE YOU KILLING US?" POLOFF REPLIED THAT HE HAD NOT COME TO ARGUE USG POLICY WITH MUSHTAQ BECAUSE THAT WOULD MERELY INVOLVE LONG WRANGLE AND POLEMICS. RATHER, HE HAD COME TO HEAR FROM "FONMIN" LATTER'S VIEWS OF PRESENT BD POLICIES AND SITUATION, AS WELL AS HIS ESTIMATE OF PROSPECTS FOR FUTURE. MUSHTAQ QUICKLY AGREED THAT "PROPAGANDA ARGUMENTS ARE USELESS, "AND ADDED THAT HE IS PRACTICAL AND REALISTIC MAN.

4. MUSHTAQ SAID HE HAD WANTED TO TALK TO USG REP FOR SOME TIME, BUT HAD BEEN UNABLE TO THINK OF SUITABLE WAY TO DO SO. DURING HIS INTERVIEW WITH THIS CORRESPONDENT SEPTEMBER 26 (SEE CALCUTTA 2564) HE HAD QUESTIONED COGGIN ABOUT US POLICY. LATTER HAD TRIED TO GIVE MUSHTAQ BRIEF OUTLINE, BUT STRONGLY SUGGESTED THAT IF MUSHTAQ REALLY WANTED TO KNOW, HE GET IN TOUCH WITH US CONSUL GENERAL OR POLOFF. MUSHTAQ SAID HE HAD DECIDED THIS MIGHT BE USEFUL AND ASKED HOSSAIN ALI TO CALL POLOFF.

5. POLOFF ASKED WHAT BDG EXPECTED FROM USG. MUSHTAQ REPLIED, "STOP HELPING YAHYA. STOP HELPING KILL MY INNOCENT PEOPLE. YOU HAVE PRACTICALLY FORCED MY PEOPLE INTO THE LAP OF THE EXTREMISTS. WHAT IS OUR CRIME? YOU MUST PUT PRESSURE ON YAHYA TO STOP. YOU HAVE MINIMIZED MY POPULATION. ONE MILLION OF THEM ARE DEAD. ANOTHER NINE MILLION HAVE BEEN FORCED TO FLEE TO INDIA AND BURMA, WHERE THEY ARE NOT WANTED. YOU HAVE DONE THIS WITH YOUR ARMS, YOUR MONEY, YOUR FOOD, YOUR TRANSPORT, YOUR MEDICINES -- ALL OF WHICH HAVE BEEN USED BY YAHYA'S TROOPS AGAINST US. I DON'T LIKE TO SPEAK THIS WAY TO A REPRESENTATIVE OF MY OLD FRIENDS, BUT YOU ASKED ME WHAT WE EXPECT FROM THE GREAT DEMOCRATIC UNITED STATES. I HOPE YOU DON'T MIND IF I SPEAK FRANKLY. I HAVE STUDIED YOUR POLICY. YOU ARE NOT WEAK. YOU CAN TELL YAHYA 'DON'T USE OUR ARMS.' ONLY YOU CAN DO THAT." WHEN POLOFF DEMURRED THAT PAKISTAN HAD BULK OF ARMS FROM CHINA, MUSHTAQ REPLIED, "THE CHINESE SAY YOU HAVE SUPPLIED MOST OF THE ARMS TO PAKISTAN."

SECRET

NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

NODIS NODIS NODIS

Department of State **TELEGRAM**

SECRET

-3- S E C R E T SECTION 1 OF 3 CALCUTTA 2575, NODIS, SEP 29

6. MUSHTAQ CONTINUED THAT HE WAS NOT RPT NOT A COMMUNIST, NOR A COMMUNIST SYMPATHIZER. HE SAID, "I AM A CONSCIOUS ANTI-COMMUNIST. THAT MEANS I AM A MUCH MORE DEDICATED ANTI-COMMUNIST THAN ORDINARY ANTI-COMMUNISTS." HE SAID USG COULD, BY FOLLOWING PRESENT POLICY, HELP EXTREMISTS WIN OUT IN BD AND DENY AL ITS DEMOCRATIC VICTORY. HE SAID, "IT IS THE UNITED STATES UPON WHOM YAHYA NOW LEANS. IF YOU WANT TO, YOU CAN MAKE HIM SEE ALT IS THE RIGHT THING TO DO."

7. TURNING TO RECENT EVENTS, MUSHTAQ SAID BD WAS FORCED INTO ACCEPTING COMMUNISTS ON CONSULTATIVE COMMITTEE. HE SAID FIRST NOTION WAS TO FORM WAR COUNCIL, WHICH HE AND OTHER LEADERS REJECTED. "NEXT, THEY WANTED TO FORM A LIBERATION FRONT, WHICH I ALSO RESISTED AS HARD AS I COULD," HE SAID. BUT HE WAS "FORCED" FINALLY TO ACCEPT "LOWEST COMMON DENOMINATOR," THE CONSULTATIVE COMMITTEE. HE SAID COMMITTE WAS ONLY ADVISORY BODY AT PRESENT TIME, BUT ADDED, "WE WILL HAVE TO ACCEPT MORE IN THE NEXT SIX MONTHS IF YOU DON'T INTERVENE." HE SAID, "WE WANT YOUR SHOULDER TO LEAN ON."

8. POLOFF AT THIS JUNCTURE REVIEWED SEQUENCE OF EVENTS AS WE KNEW THEM, I.E., WE WERE INFORMED BY BD SOURCE THAT BDG (AND SPECIFICALLY MUSHTAQ) HAD WANTED TO SPEAK TO USG IN EARLY AUGUST AND HAD EXPRESSED DESIRE TO TALK TO GOP IN MID-AUGUST. POLOFF SAID CONGEN HAD REPORTED ALL THIS TO WASHINGTON, AND THAT IN LATE AUGUST SUBSTANCE HAD BEEN CONVEYED TO YAHYA, WHO HAD EXPRESSED INTEREST. IN PASSING WORD OF THIS INTEREST TO MUSHTAQ, POLOFF WAS MERELY ACTING AS MESSENGER, NOT PROPOSING NEGOTIATIONS. HE WOULD BE WILLING RELAY ANY WORD FROM MUSHTAQ.

9. POLOFF'S REMARKS CAUSED MUSHTAQ TO PAUSE AND THINK FOR A MOMENT, AND THEN HE REPLIED THAT HE HAD ALWAYS WISHED TO TALK TO "UNITED STATES, OUR GREAT FRIENDS," AS WAS EVIDENT BY HIS PRESENCE, IN HOPES THAT IT IS STILL NOT TOO LATE TO ASK FOR
BT

SECRET

NODIS NODIS NODIS NODIS

*Department of State* **TELEGRAM**

SECRET

CONTROL: 7844Q
RECD: 29 SEP 11 19Z

O 290900Z SEP 71
FM AMCONSUL CALCUTTA
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 2283
BT
S E C R E T SECTION 2 OF 3 CALCUTTA 2575

DEPT PLEASE PASS NEW DELHI, ISLAMABAD, DACCA

US ASSISTANCE. HE SAID, "WE WANTED YOU TO HELP US PRESERVE OUR DEMOCRATIC STRUCTURE." HE SAID BDG WANTED USG PROTECTION FROM PAKISTANIS AND "OTHERS," AS WELL AS HELP IN ASSURING THAT "NO ONE INTERFERES IN OUR AFFAIRS." POLOFF SAID HE THOUGHT BDG AND OTHERS MIGHT HAVE EXAGGERATED NOTION OF HOW MUCH INFLUENCE USG HAD WITH GOP AND DOUBTED THAT USG COULD EVER "TELL" YAHYA WHAT TO DO. HE REPEATED THAT HE HAD ONLY COME TO HEAR MUSHTAQ'S VIEWS, AND TO OFFER, IF MUSHTAQ SO DESIRED, TO REPORT THOSE VIEWS TO WASHINGTON AND ASK THAT THEY BE TRANSMITTED TO YAHYA. MUSHTAQ REPLIED THAT HE SAW NO VALUE IN HIS TALKING TO GOP BECAUSE IT NOT NECESSARY. HE SAID, " I KNOW YAHYA. I KNOW HIM TO BE A GOOD MAN AND I THINK HE KNOWS THAT I AM A GOOD MAN, BUT ONLY YOU CAN INFLUENCE HIM. I NEVER THOUGHT HE WOULD DO THIS. HE WILL NOT LISTEN TO ME NOW." HE ADDED THAT YAHYA MIGHT NOT BE "HIS OWN MAN" RIGHT NOW AND SAID HE SUSPECTED YAHYA MAY BE SOMEWHAT CIRCUMSCRIBED BY CERTAIN PEOPLE AND EVENTS. NEVERTHELESS, HE SAID HE BELIEVES USG CAN INFLUENCE GOP TO SEE REASON.

10. IN DISCUSSING BDG DESIRE HAVE SHEIKH MUJIB FREED, POLOFF REMINDED MUSHTAQ USG HAD MADE PUBLIC APPEAL TO GOP. MUSHTAQ REPLIED THAT HE AWARE OF THIS, BUT ADDED, "MOSCOW IS ALSO CLAIMING IN NEW DELHI THAT THEY KEPT THE SHEIKH ALIVE. EVEN OTHERS ARE MAKING THE SAME CLAIM. WE DO NOT KNOW WHOM TO BELIEVE, BUT WE DO KNOW ONLY YOU CAN FREE HIM." HE ASKED THAT USG MAKE FRESH EFFORT TO PUSH GOP TO RELEASE MUJIB.

11. MUSHTAQ SAID HE WOULD LIKE TO INFORM USG OF DESIRES AND PRINCIPLES OF BDG, AND WOULD LIKE IN RETURN TO "HEAR WHAT USG HAS TO SAY" ABOUT THEM AS SOON AS POSSIBLE. HE SAID HE WOULD LIKE TO GIVE POLOFF LIST OF BDG "DESIRES," AND REQUESTED THAT

SECRET

NODIS NODIS NODIS

Department of State **TELEGRAM**

SECRET

-2- S E C R E T SECTION 2 OF 3 CALCUTTA 2575, NODIS, SEP 29

LIST BE PREFACED WITH STATEMENT THAT IT IS MERELY GENERAL STATEMENT OF BDG PRINCIPLES AND NOT RPT NOT CAREFULLY CONSIDERED PRECISE WORDING TO BE QUIBBLED ABOUT LATER. HE SAID HE WOULD NOT RPT NOT WISH TO BE HELD ACCOUNTABLE FOR HIS PRECISE WORDING BECAUSE HE IS INEXPERIENCED IN DIPLOMACY AND WOULD HAVE TO OBTAIN CABINET APPROVAL FOR EXACT WORDING AT LATER DATE, IF CIRCUMSTANCES WARRANTED. LIST OF BDG DESIRES FOLLOWS:

(A) FULL INDEPENDENCE FOR BD

(B) RELEASE SHEIKH MUJIB

(C) AFTER INDEPENDENCE, MASSIVE, LONG-TERM ECONOMIC ASSISTANCE FROM USG TO HELP RECONSTRUCT NATION AND QUICK INPUT HUMANITARIAN AID FROM USG TO GET PEOPLE BACK ON FEET

(D) AFTER INDEPENDENCE, ESTABLISHMENT OF NORMAL DIPLOMATIC AND BUSINESS RELATIONS WITH PAKISTAN

(E) DETAILS AND MODALITIES OF PLANS FOR HANDING OVER NATION TO BD LEADERS AND WITHDRAWAL PAK ARMY TO BE WORKED OUT IN CONSULTATIONS BETWEEN BDG, USG AND GOP

(F) PRELIMINARY STEPS TO BE DISCUSSED WITH GOP VIA USG

(G) SOLE CHANNEL AT PRESENT TO BE FONMIN TO POLOFF VIA "HIGH COMMISSIONER."

MUSHTAQ CAPPED OUTLINE OF LIST BY SAYING USG "MUST TAKE THE LEAD, OTHERWISE THE RUSSIANS WILL DO SO." HE SAID HE AND OTHER BDG LEADERS PREFERRED THAT USG TAKE ACTIVE ROLE AND THAT MOST OF THEM WERE APPREHENSIVE OF SOVIET ROLE, "ALTHOUGH CONFIDENCE IN THE UNITED STATES IS NOW A LITTLE SHAKY." HE SAID IF IT TURNS OUT TO BE IMPOSSIBLE TO REACH PEACEFUL SETTLEMENT, BDG WOULD PURSUE WAR FOR INDEPENDENCE UNTIL IT WON, "DESPITE YOUR GUNS." HE SAID HE REALIZED PROSPECTS FOR RADICALIZATION OF BD MOVEMENT IN SUCH AN EVENTUALITY AND KNEW SOVIETS NOW TRYING TO TAKE IT OVER BUT SAID BDG HAD NO OTHER CHOICE.

12. IN RESPONSE POLOFF'S REMARK THAT HE NOTED MUSHTAQ HAD WELCOMED INDO-SOVIET TREATY, FONMIN SAID, "YOU ONLY READ THE FIRST SENTENCE. READ THE LAST ONE." (LAST SENTENCE SAYS,

SECRET

NODIS NODIS NODIS

Department of State **TELEGRAM**

SECRET

-3- S E C R E T SECTION 2 OF 3 CALCUTTA 2575, NODIS, SEP 29

"WE ARDENTLY HOPE THAT THIS TREATY WILL BE HELPFUL IN FULFILLING THE ASPIRATIONS OF THE SMALL AND EMERGING NATIONS DESPITE THE CRUDE BELLICOSITY OF MEN LIKE YAHYA KHAN OF PAKISTAN.") HE ADDED, "I AM A REALISTIC MAN. I CAN LIVE WITH WHATEVER IS NECESSARY FOR US TO WIN."

13. AT THIS JUNCTURE, MUSHTAQ CALLED IN HOSSAIN ALI AND ASKED HIM TO NOTE DOWN LIST OF BDG "DESIRES" HE HAD GIVEN POLOFF AND READ THEM BACK, "SO THAT WE UNDERSTAND EACH OTHER FULLY." WHEN ALI HAD FINISHED, MUSHTAQ SAID, "ALL THIS BOILS DOWN TO ONE CENTRAL POINT. IF THE UNITED STATES WANTS TO DO IT, IT CAN DO IT. THE ONUS IS ON THE UNITED STATES, IF THE UNITED STATES IS INTERESTED IN HELPING US ACHIEVE OUR DEMOCRATIC FREE-DOM. TIME IS RUNNING AGAINST US. BUT FIRST, THE UNITED STATES MUST MAKE UP ITS MIND WHETHER IT WANTS TO HELP BANGLADESH." HE NOTED (BUT SUGGESTED POLOFF NEED NOT REPORT) THAT IN EFFECT BDG IS ASKING FOR COMPENSATION FOR ITS LOSSES FROM USG RATHER THAN GOP, "WHICH IS TOO POOR."

14. MUSHTAQ AND POLOFF AGREED THAT DISCUSSION, AND ANY OTHERS WHICH MIGHT BE HELD IN FUTURE, WOULD BE CONSIDERED PRIVATE AND CONFIDENTIAL. (MUSHTAQ TOLD ALI, "MAKE ALL THIS TOP SECRET.") HE SAID USG SHOULD USE POLOFF'S REPORT OF CONVERSATION IN ANY WAY IT THINKS BEST. IF USG WISHES CONVEY LIST OF BDG DESIRES TO GOP, IT SHOULD FEEL FREE TO DO SO IF IT BELIEVES IT WILL SERVE USEFUL PURPOSE. HE SAID HE HOPED HE COULD BE PROVIDED WITH USG REACTION TO HIS REMARKS AT EARLIEST POSSIBLE MOMENT. HE SAID HE KNEW WASHINGTON IS SOMETIMES TOO BIG TO SEE SMALL THINGS (READ BD), BUT HOPED THAT IN THIS CASE SYMPATHETIC HIGH-LEVEL ATTENTION WOULD BE FOCUSED ON 70 MILLION PEOPLE AND 55 THOUSAND SQUARE MILES OF BD.

15. MUSHTAQ EXPRESSED HOPE HE COULD MAINTAIN DIRECT CONTACT WITH POLOFF VIA HOSSAIN ALI "CONDUIT." HE SAID HE HAD AUTHOR-IZED NO RPT NO OTHER CHANNEL TO USG AND THAT IF HE DID SO, HE WOULD SO INFORM POLOFF. HE ADDED THAT HE AWARE THAT NUMBER OF OTHER WELL-INTENTIONED LEADERS OF BD HAD MADE CONTACT WITH USG REPS, BUT THAT THEY NOT OFFICIAL CHANNEL. HE FELT CERTAIN OTHERS HAD MADE CONTACT IN EFFORT TO GAIN GENERAL IMPRESSION OF USG POLICY. HE ASKED IF USG HAD AUTHORIZED ANYONE ELSE TO TALK TO BDG AND POLOFF RESPONDED IN NEGATIVE, SAYING HE WOULD

SECRET

NODIS NODIS NODIS

*Department of State* **TELEGRAM**

SECRET

-4- S E C R E T SECTION 2 OF 3 CALCUTTA 2575, NODIS, SEP 29

INFORM MUSHTAQ WHEN AND IF DEPT. DID SO. POLOFF NOTED, HOWEVER, THAT AMERICAN OFFICIALS MIGHT ENCOUNTER BD REPS IN VARIETY OF PLACES, SUCH AS DELEGATES LOUNGE AT UN, AND THAT HE EXPECTED NORMAL EXCHANGE OF VIEWS WOULD TAKE PLACE. MUSHTAQ SAID THAT IS WHY HE WANTED TO GO TO UNGA; HE HAD HOPED HE WOULD FIND OCCASION THERE TO MEET SECRETARY
BT

SECRET

NODIS NODIS NODIS

**Department of State** **TELEGRAM**

SECRET

CONTROL: 7845Q
RECD: 29 SEP 11 19Z

O 290900Z SEP 71
FM AMCONSUL CALCUTTA
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 2284
BT
S E C R E T SECTION 3 OF 3 CALCUTTA 2575

~~NODIS~~

DEPT PLEASE PASS NEW DELHI ISLAMABAD DACCA

ROGERS. HOWEVER, USG HAD "KEPT HIM FROM GOING." ASKED TO ELABORATE, SINCE POLOFF HAD HEARD OF NO VISA APPLICATION FROM FONMIN, MUSHTAQ SAID HE HAD BEEN TOLD USG WOULD FIND HIS PRESENCE IN NEW YORK HIGHLY EMBARRASSING. SINCE HE DID NOT WISH TO EMBARRASS "OUR OLD AND GREAT FRIEND," HE HAD DECIDED NOT TO GO.

16. MUSHTAQ SAID HE BELIEVED USE OF BDHC AS MEETING PLACE WAS MOST FEASIBLE FROM ALL STANDPOINTS, NOTING THAT MAJOR CONSIDERATION WAS ABILITY TO TALK "WHERE THEY (READ INDIAN INTELLIGENCE PERSONNEL) CAN'T LOOK OVER OUR SHOULDERS." (COMMENT: POLOFF'S ARRIVAL AND DEPARTURE WERE HANDLED DISCREETLY. HE WAS MET AT GATE BY HOSSAIN ALI AND GAVE HIS NAME TO NO ONE ELSE. WE AGREE WITH MUSHTAQ ON DESIRABILITY OF LOCALE IN LIGHT REMARKS OF QAIYUM'S MESSENGER NOTED REFTEL. END COMMENT) IN PARTING MUSHTAQ TIGHTLY GRASPED POLOFF'S HANDS WITH BOTH HIS AND SAID, "I HOPE WE MEET AGAIN SOON. I HOPE THE UNITED STATES WILL COME TO OUR AID."

17. COMMENT: MUSHTAQ'S REMARKS WERE MUCH THE SAME AS REPORTED BY TIME CORRESPONDENT COGGIN, AND REPRESENT JUST ABOUT WHAT MIGHT BE EXPECTED FROM FIRST MEETING WITH USG REP. MUSHTAQ IMPRESSED POLOFF AS INTELLIGENT, CLEVER, PRAGMATIC, BASICALLY FRIENDLY AND REASONABLY ARTICULATE; CERTAINLY NOT AS HAZY AS REPORTED BY BRITISH MP SHORE (CALCUTTA 2438) BUT ADMITTEDLY HANDICAPPED BY INEXPERIENCE IN FOREIGN AFFAIRS. HE APPARENTLY PLACES CONSIDERABLE RELIANCE ON GROWING STAFF OF PROFESSIONAL FOREIGN SERVICE OFFICERS. IT INTERESTING THAT MUSHTAQ NEVER ADMITTED USE OF QAIYUM OR OTHERS IN NEW DELHI AS CHANNEL TO USG, THOUGH HIS COMMENTS

SECRET

NODIS NODIS NODIS

*Department of State* **TELEGRAM**

SECRET

-2- S E C R E T SECTION 3 OF 3 CALCUTTA 2575, NODIS, SEP 29

IMPLIED HE HAS SOUGHT USE BOTH THOSE SOURCES AND PERHAPS
OTHERS TO GATHER KNOWLEDGE ABOUT US INTENTIONS AND POLICIES, AND
THAT HE OBVIOUSLY WISHES TO STEER CLEAR OF INDIANS AND SOVIETS
IN ATTEMPT TO FIND SOLUTIONS. ON BASIC PURPOSE OF MEETING --
TO ASCERTAIN WHETHER BDG INTERESTED IN NEGOTIATING SETTLEMENT
DIRECTLY WITH GOP -- MUSHTAQ'S STATEMENTS AND FAR-REACHING
LIST OF DEMANDS REVEALED DISTINCTLY NEGATIVE POSITION. HE
OBVIOUSLY SAW MEETING AS OPPORTUNITY TO TRY INVOLVE USG IN
SETTLEMENT EFFORT AND POST-SETTLEMENT PROBLEMS, RATHER THAN
AS CHANNEL TO GOP, DESPITE POLOFF'S EMPHASIS THAT US ROLE ONLY
THAT OF LISTENER AND MESSENGER. THIS AGAIN MAY REFLECT
"FIRST MEETING" SYNDROME, AND ESTABLISHMENT IN BARGAINING
POSITION, BUT APART FROM HIS REFERENCE TO YAHYA AS "GOOD MAN."
CONVERSATION ELICITED NO RPT NO INDICATION THAT BDG PREPARED
TALK WITH GOP AT THIS STAGE. GP-2.

GORDON

BT

NOTE: NOT PASSED NEW DELHI ISLAMABAD DACCA BY OC/T - SEP 29

SECRET



Source: Khasru

## পরিশিষ্ট ২

# ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থী, ২৫ মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

| রাজ্য | স্থানীয় জনসংখ্যা (হাজার) | শরণার্থী (হাজার) | স্থানীয় জনসংখ্যার শতাংশ |
|---|---|---|---|
| আসাম | ১৪,৯৫২ | ৩১৩ | ২.০৯ |
| বিহার | ৫৬,৩৮৩ | ৯ | ০.০২ |
| মেঘালয় | ৯৮৩ | ৬৬৮ | ৬৭.৯৬ |
| ত্রিপুরা | ১,৫৫৭ | ১,৪১৬ | ৯০.৯৪ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ৪৪,৪৪০ | ৭,৪৯৩ | ১৬.৮৬ |
| **মোট** | | **৯,৮৯৯** | |

সূত্র : Bangladesh Documents, Vol. II, p. 82

# তথ্যসূত্র

## সংলাপ


১. Khan, Arshad Sami (2008). *Three Presidents and an Aide: Life Power and Politices*. Pentagon Press, New Delhi, p. 129-133

২. Ibid

৩. Ibid

৪. আমানউল্লাহ

৫. Chowdhury, G. W. (1994). *The Last Days of United Pakistan*. UPL, Dhaka, p. 128

৬. Khan, Sultan M (1997). *Memoirs & Reflections of a Pakistani Diplomat.* The London Centre for Pakistan Studies, London, p. 287-288

৭. *The Pakistan Times*, Lahore, 21 December 1970; *Bangladesh Documents*, Vol. 1, Ministry of External Affairs, New Delhi, p. 132-133

৮. *The Pakistan Observer*, 22 December 1970; *Bangladesh Documents*, Vol. 1, p. 133

৯. Matinuddin, Lt. Gen. Kamal. *Tragedy of Errors: East Pakistan Crisis 1968-1971*. Wajidalis, Lahore, p. 146

১০. লেখকের স্মৃতি থেকে। লেখক ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন

১১. Blood, Archer K (2006). *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*. UPL, Dhaka, p. 136

১২. লেখকের স্মৃতি থেকে। লেখক ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন

১৩. ইসলাম, মযহারুল (১৯৯৩)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৩৩

১৪. Sobhan, Rehman (2016). *Untrunquil Recollection: The Years of Fulfilment*. Sage, New Delhi, p. 316-317

১৫. Khan, Arshad Sami, p. 134

১৬. Ibid

১৭. Ibid

১৮. Ibid, p. 135-140

১৯. Ibid, p. 134-143
২০. Ibid, p. 146-147
২১. Ibid, p. 148-149
২২. Matinuddin, p. 152-154
২৩. *The Pakistan Observer*, 29 January 1971; Humayun, Syed (1995). *Sheikh Mujib's 6-Point Formula Analytical Study of the Breakup of Pakistan.* Royal Book Company, Karachi, p. 346-347
২৪. *Pakistan Times*, 1 March 1971; Humayun, p. 354-355
২৫. Ibid
২৬. Chowdhury, p. 154
২৭. Karim, S. A. (2009). *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*. UPL, Dhaka, p. 177-178; quoted from Rao Farman Ali (1992). *How Pakistan Got Divided*. Jang Publishers, Lahore, p. 56
২৮. Bhutto, Zulfiquar Ali (1993). *The Great Tragedy*. Jang Publishers, Lahore, p. 64-65
২৯. Khan (1997), p. 288-292
৩০. Ibid
৩১. Ibid
৩২. Karim, p. 178
৩৩. Hossain, Kamal (2013). *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*. UPL, Dhaka, p. 71-73
৩৪. Matinuddin, p. 241
৩৫. *The Pakistan Observer*, 17 February 1971
৩৬. Karim, p. 179-180
৩৭. *Dawn*, Karachi, 20 February 1971; *Bangladesh Documents*, Vol. 1, p. 166-168
৩৮. *Pakistan Times*, 22 February 1971
৩৯. Karim, p. 181
৪০. Sisson, Richard & Rose, Leo (1990). *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh*. University of California Press, California, p. 89-90; based on interview with S M Ahsan (1979).
৪১. খান, রাও ফরমান আলী (২০০৫)। *বাংলাদেশের জন্ম*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৫৮
৪২. Sisson & Rose, p. 90
৪৩. হাসান, মঈদুল (২০১৫)। *উপধারা একাত্তর : মার্চ-এপ্রিল*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৬৩
৪৪. Blood, p. 146-147
৪৫. Ibid, p. 147-148

৪৬. *Le Monde*, Paris, 31 March 1971; cited in Ali, Tariq (1983). *Can Pakistan Survive: The Death of a State*. Penguin Books, Middlesex, p. 90
৪৭. খান, লে. জেনারেল গুল হাসান (১৯৯৬)। *পাকিস্তান যখন ভাঙলো*। সংকলন ও অনুবাদ এ টি এম শামসুদ্দীন, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২১-২৩
৪৮. Blood, 148-152
৪৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ মার্চ ১৯৭১
৫০. Blood, p. 157
৫১. Chowdhury, p. 156-157

## অপারেশন সার্চলাইট

১. Raja, Major General (Retd) Khadim Hussain (2012). *A Stranger in My Own Country*. Oxford University Press, Karachi, p. 50-55
২. মমতাজ বেগম
৩. হক, আবুল কাসেম ফজলুল (১৯৭২)। *মুক্তি সংগ্রাম*, প্রথম পর্ব। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৫১-২৭৫
৪. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪)। *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৭৪
৫. চৌধুরী, নীরদচন্দ্র (১৯৯৩)। *আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, পৃ. ১০৫
৬. খান (১৯৯৬), পৃ. ২৫
৭. Ali, Rao Farman (1992), quoted by Karim, p. 184; Sisson & Rose, p. 98
৮. Blood, p. 167
৯. Raja, p. 57; Sobhan, p. 327
১০. আলী, রাও ফরমান (১৯৭৮)। *ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ*। অনুবাদ : মোস্তফা হারুন, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬০-৬১
১১. Hossain, p. 86
১২. Ibid, p. 86-87
১৩. *Dawn*, 7 March 1971
১৪. Chowdhuary, p. 158
১৫. Sobhan (2016), p. 328-329
১৬. Raja, p. 60-62
১৭. Khan, M. Asghar (2006). *We've Learnt Nothing from History—Pakistan: Politics and Military Power*. p. 38
১৮. White House Tapes, Oval Office 462-5, 5 March 1971, 8:30-10:15 am; 505-4, 26 May 1971, 10:03-11.35 am; cited in Bass, Garry J (2013). *The*

*Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide*. Alfred A. Knoph, New York, p. 7

১৯. Bass, p. 25

২০. Ibid, p. 26

২১. NSC Files, Box 625, Country Files-Middle East, Pakistan, Vol. iv, Kissinger to Nixon, 13 March 1971; cited in Bass, p. 31

২২. Hossain, p. 91

২৩. *Dawn*, 15 March 1971

২৪. Ibid, 16 March 1971

২৫. Ibid

২৬. হোসেন, ড. কামাল (২০০৫)। *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*। অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯০

২৭. Matinuddin, p. 243-244

২৮. Ibid

২৯. তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*। পঞ্চদশ খণ্ড, ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২৬৯

৩০. ওই, পৃ. ২৭২

৩১. Bhutto (1993), p. 40; Karim, p. 190

৩২. শাজাহান সিরাজ

৩৩. সিরাজুল আলম খান

৩৪. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২৭০

৩৫. হোসেন (২০০৫), পৃ. ৮৪

৩৬. তথ্য মন্ত্রণালয়, ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২৭৭

৩৭. Ministry of Information and National Affairs, Government of Pakistan (1971). *White Paper on the Crisis in East Pakistan*. Islamabad, p. 47-59

৩৮. Ibid

৩৯. খান (১৯৯৬), পৃ. ৩১-৩২

৪০. Kutty, B.M. (2009), ed. *In Search of Solutions : An Autobiography of Mir Ghaus Bakhsh Bizenjo*. Pakistan Study Centre, University of Karachi, p. 148

৪১. Ibid, p. 149-150

৪২. Ibid, p. 153

৪৩. Blood, p. 192

৪৪. Matinuddin, p. 245

৪৫. *ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ ১৯৭১; বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রিপোর্ট, এপ্রিল ১৯৭২

৪৬. সোবহান, রেহমান (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*। ভোরের কাগজ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০৭
৪৭. Bhutto (1993), p. 44-45
৪৮. Khan, Z. A. (1998). *The Way It Was*. Dyanovis (Private) Ltd, Karachi, p. 262-271; অনুবাদ ফারুক মইনউদ্দীন, *প্রথম আলো*, ২৫ মার্চ ২০০২
৪৯. মোস্তফা মহসীন মন্টু
৫০. আবদুর রাজ্জাক
৫১. *Bangladesh Documents*, Vol. II, Ministry of External Affairs, New Delhi, p. 615
৫২. Khan, Arshad Sami, p. 150-151
৫৩. কোহিনূর হোসেন
৫৪. Khan, Arshad Sami, p. 158-159
৫৫. Matinuddin, p. 248; based on interview with Gen. Tikka Khan
৫৬. Karim, p. 224
৫৭. Hossain, p. 108-110
৫৮. Ibid, p. 225
৫৯. Khan, Arshad Sami, p. 166
৬০. 'The Untold Story of Dr. Abu Hena', interview taken by Anwar Parvez Halim on 2 December 2014, *Probe*, issue 5, Volume 13, December 16-31, 2014, Dhaka, p. 19-22
৬১. আরিফ মঈনুদ্দীন
৬২. খান (১৯৯৬), পৃ. ১৫১
৬৩. লেখক ১৯৯৬ সালের আগস্টে ইসলামাবাদে ছিলেন এবং গণমাধ্যমে বিষয়টি দেখেছেন
৬৪. Rushd, Abu (2009), ed. *Secret Affidavit of Yahya Khan on 1971*. Bangladesh Defence Journal Publishing, Dhaka, p. 37-48
৬৫. Ibid, p. 46
৬৬. Ibid, p. 84
৬৭. Ibid, p. 13

### স্বাধীনতা ঘোষণা

১. চৌধুরী, আমীন আহম্মেদ (২০১৬)। *১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২১-২৮
২. ওই, পৃ. ২৯
৩. ওই
৪. ওই

৫. ইসলাম, মেজর রফিকুল (২০১৪)। *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*। অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১২০
৬. ওই, পৃ. ১৫১-১৫২
৭. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), এম এ হান্নানের সাক্ষাৎকার, পৃ. ১৯০-১৯১
৮. ওই, এম আর সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার, পৃ. ১৮১-১৮৪
৯. এস এম ইউসুফ
১০. হাসিনা, শেখ ও মওদুদ, বেবী সম্পাদিত (২০১৫)। *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৫-১৬
১১. Gandhi, Indira (1972). *India and Bangla Desh: Selected Speeces and Statements March to December 1971*. Orient Longman, New Delhi, p. 85-86
১২. সিরাজুল আলম খান
১৩. হাসিনা ও মওদুদ, পৃ. ৩৯
১৪. Ahmad, Col, Oli (2008). *Revolution Military Personnel and the War of Liberation in Bangladesh*. Annesha Prokashon, Dhaka, p. 30-31
১৫. চৌধুরী খালেকুজ্জামান
১৬. মোহাম্মদ, বেলাল (১৯৯৩)। *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩
১৭. Ahmad, Col. Oli (2008), p. 158-161
১৮. শফী, বেগম মুশতারী (১৯৮৯)। *স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন*। প্রিয়ম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০১
১৯. Ahmad, Col. Oli (2008), p. 161-162
২০. মোহাম্মদ (১৯৯৩), পৃ. ৪০
২১. অলি আহমদ
২২. ওই
২৩. Ahmad, Col. Oli (2008), p. 169
২৪. সমশের মুবিন চৌধুরী, অলি আহমদ, চৌধুরী খালেকুজ্জামান
২৫. সমশের মুবিন চৌধুরী
২৬. ওই
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ মার্চ ১৯৭২; উদ্ধৃত হয়েছে, রহমান, ড. সাঈদ-উর (২০০৪)। *১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল*। মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৫
২৮. ইসলাম (২০১৪), পৃ. ১৬১
২৯. লেনিন, নূহ-উল-আলম (২০১৫)। *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*। সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩০৪
৩০. বাংলাদেশ গেজেট, এক্সট্রা অর্ডিনারি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯৫-৩৪৭৬

৩১. *দৈনিক বাংলা,* ১ এপ্রিল ১৯৭২। উদ্ধৃত হয়েছে, রহমান, সাঈদ-উর (২০০৪)। পৃ. ৫৫
৩২. হাসান, মঈদুল (২০১৫), পৃ. ১২৯-১৩২
৩৩. Sobhan, Rehman (2015). *From Two Economies to Two Nations; My Journy to Bangladesh*. Daily Star Books, Dhaka, p. 288
৩৪. আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০)। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*। পৃ. ৯০
৩৫. লেনিন, পৃ. ৩৩২

**জঙ্গনামা**

১. হাই, মুহাম্মদ আবদুল ও পাশা, আনোয়ার সম্পাদিত (১৯৬৭)। *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃ. ২
২. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ (১৯৯৩)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*। ইউপিএল, ঢাকা। পৃ. ৭৯-৮৩; খোকা, মমিনুল হক (২০১৬)। *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল : বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৪১-১৪২
৩. Blood, p. 301
৪. Ibid
৫. মিয়া, পৃ. ৮৪
৬. Gandhi, p. 11-12
৭. Ibid, p. 14
৮. Sobhan (2016), p. 361
৯. Ibid, p. 364-365
১০. খন্দকার, এ কে; হাসান, মঈদুল; মির্জা, এস আর (২০১১)। *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৪-২৫
১১. সিরাজুল আলম খান; আহমদ (২০১৪), পৃ. ৪৪
১২. Karim, p. 204
১৩. Ibid, p. 208-209
১৪. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), আমীর-উল-ইসলামের সাক্ষাৎকার; Sobhan (2016), p. 367
১৫. Rajgopal, P. V. ed. (2009). *From the Diaries and Articles of K. F. Rustamji The British the Bandits and the Bordermen*. Wisdom Tree, New Delhi, p. 305
১৬. মেজর অব. রফিকুল ইসলাম; 'যুদ্ধ শুরু হলো যেভাবে', *আমাদের একাত্তর,* আহমদ, মহিউদ্দিন সম্পাদিত (২০০৬), সিডিএল, ঢাকা, পৃ. ৭০

১৭. লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী; 'সেদিন কেন অস্ত্র ধরেছিলাম', আহমদ (২০০৬), পৃ. ৫৯
১৮. জামিল, কর্নেল (অব.) শাফায়াত (২০০০)। *একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২৬-২৭
১৯. Ahmad, Col Oli (2009), *Battles That I Fought and Interviews of Liberation War Heroes*. Annesha Prokashon, Dhaka, p. 62, 144
২০. সমশের মুবিন চৌধুরী
২১. ইসলাম (২০১৪), পৃ. ১৯১
২২. সমশের মুবিন চৌধুরী
২৩. Ahmad (2009), p. 68-69
২৪. খন্দকার ও অন্যান্য, পৃ. ১১৬-১১৭
২৫. লেখক বিএলএফের সদস্য ছিলেন
২৬. এম হোসেন আলীর অপ্রকাশিত ডায়েরি
২৭. ওই
২৮. ওই
২৯. Sisson & Rose, p. 149-150
৩০. আবু হেনা
৩১. Raina Ashok (1981). *Inside RAW: the story of India's secret service.* Vikas Publishing House, New Delhi p. 49
৩২. Haksar Papers, Subject File 220, R&W tasking, 2 March 1971, cited in Bass, p. 47-48
৩৩. Jacob, JFR (1997). *Surrender at Dhaka: Birth of a Nation.* Manohar, New Delhi, p. 36; Jayakar, Pupul (1992). *Indira Gandhi: An Intimate Biography*. Pantheon, New York, p. 184; cited in Bass, p. 93-94
৩৪. Ibid
৩৫. Dhar, P. N. (2000). *Indira Gandhi, the 'Emergency' and Indian Democracy.* Oxford University Press. New Delhi, p. 157; cited in Raghavan, Srinath (2013). *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, p. 70
৩৬. Haksar's note to Indira Gandhi in meeting with opposition leaders on 7 May 1971, Subject File 227, P. N. Haksar, Nehru Memorial Museum and Library (NMML); cited in Raghavan, p. 70
৩৭. Khan (1997), p. 301-302
৩৮. খান (১৯৯৬), পৃ. ৩৩
৩৯. Khan (1997), p. 302-307
৪০. ইসলাম, সাইফুল (২০০২)। *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*। বর্তমান সময়, ঢাকা, পৃ. ৮৮

৪১. ওই

৪২. ওই

৪৩. খন্দকার ও অন্যান্য, পৃ. ৫৮

৪৪. আহমদ, ফয়েজ (১৯৮৮)। *মধ্যরাতের অশ্বারোহী*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২০৪-২০৫

৪৫. ইসলাম (২০০২), পৃ. ৮১-৮২

৪৬. ইসলাম (২০১৪), পৃ. ২৮৫-২৮৬

৪৭. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), কাজী জাফর আহমদের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২০৫

৪৮. আ স ম আবদুর রব

৪৯. চৌধুরী, মিজানুর রহমান (২০০১)। *রাজনীতির তিন কাল*। হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ১২১-১২২

৫০. ইসলাম (২০০২), পৃ. ৮৮

৫১. কামাল লোহানী, 'আসুন আমরা পশু হত্যা করি', আহমদ, মহিউদ্দিন (২০০৬), পৃ. ৩৫০-৩৫১

৫২. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ১২৮

৫৩. ওই, পৃ. ১১৪-১২৮

৫৪. আজিজ, শেখ আবদুল (২০০১)। *রাজনীতির সেকাল ও একাল*। দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫

৫৫. *Pakistan Observer*, 17 April 1971

৫৬. আহাদ, অলি (২০১২)। *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫*। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, পৃ. ৪২৯-৪৩০

৫৭. Blood, p. 213

৫৮. Bass, p. 34, 102

৫৯. আমানউল্লাহ

৬০. NSC Files, Box 625, Country Files-Midde East, Pakistan, Vol.V, Yahya to Nixon, 24 May, cited in Bass, p. 150; White House tapes, Oval Office, 28 June 1971, 10:23-10:51 am; cited in Bass, p. 143-144

৬১. আহাদ, পৃ. ৪৩০

৬২. White house tapes, Bass, p. 143-144

৬৩. Ted Szule, 'US Military Goods Sent to Pakistan Despite Ban'. *New York Times*, 22 June 1971

৬৪. NSC Files, Box 574, India-Pak War, South Asia Congressional, Church Speech, 22 June 1971; Kennedy Speech, 22 June 1971; cited in Bass p. 205

৬৫. Kissinger-McNamara teleon 21 June 1971, 6.40 pm; cited in Bass, p. 148

৬৬. Sydney H. Schanberg, 'Kennedy in India: Terms Pakistan Drive Genocide', *New York Times*, 17 August 1971
৬৭. White House tapes, Oval Office, 520-6, 15 June 1971, 11:02 am, 12:34 pm; cited in Bass, p. 149
৬৮. Sydney H. Schanberg, 'Bengali Refugees Stirring Strife in India', *New York Times*, 6 October 1971; Ministery of External Affairs (India), HI/1012/30/71, Kumar Memorandum, Refugee statistics, 7 September 1971; cited in Bass, p. 190-191
৬৯. Don Hechman, 'The Event Wound up as a Love Feast', *Village Voice*, 5 August 1971; Maureen Orh, 'Dylan-Rolling Again', *News Week*, 14 January 1974
৭০. Raghavan, p. 145
৭১. ওই
৭২. Khasru, B. Z. (2010). *Myths and Facts Bangladesh Liberation War*. Rupa Publications India Pvt. Ltd, New Dellhi, p. 159-160
৭৩. *The Statesman*, 16 July 1971; লেনিন (২০১৫), পৃ. ২৯৬-২৯৭
৭৪. Bass, p. 147
৭৫. Khasru, p. 161-164
৭৬. Khan (1997), p. 344
৭৭. Khasru, p. 167-175
৭৮. 'Note For the Meeting at 10 pm Tonight' by Haksar, 6 May 1971, Subject File, P. N. Haksar, NMML; cited in Raghavan. p. 73
৭৯. Khasru, p. 176
৮০. আহমদ (১৯৮৮), পৃ. ২০৫
৮১. Khasru, p. 179
৮২. Ibid, p. 192
৮৩. Ibid, p. 432
৮৪. Ibid, p. 432-438
৮৫. NSC Files, USG Contact with Bangladesh, 6 December 1971; cited in Bass, p.147
৮৬. Ministry of External Affairs (India) WII/109/31/71, Vol. 1, Singh-Keating Discussion, 7 December 1971; cited in Bass, p. 248
৮৭. R. N. Kao to Haksar, 4 August 1971, conveying message from Kaul to Haksar, sent on 3 August 1971, Subject File 220, P. N. Haksar Papers; S. P. Chibber (Special Represantative, Salgad) to G. L. Seth (Secretary, Production, Ministry of Defence), 14 January 1993; Golda Meir to Shlomo Zabludowicz, 23 August 1971; cited in Raghavan. p. 182-183
৮৮. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), ড. কামাল সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার, পৃ. ২০৯-২১০

৮৯. Karim, p. 229
৯০. Chowdhury, Hamidul Huq (2012). *Memoirs: Autobiography.* Re-edited and digitized by N&M Schede, p. 235
৯১. Khasru, p. 193
৯২. Ibid, p. 149-150
৯৩. Ibid
৯৪. Ibid, p. 151-152
৯৫. Khan (1997), p. 320
৯৬. Ibid, p. 340
৯৭. Khasru, p. 155-156
৯৮. Ibid

## শেষ দৃশ্য

১. Gandhi, p. 87
২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ নভেম্বর ১৯৭১
৩. Karim, p. 229
৪. *Hindustan Standard*, 6 November 1971
৫. Raghavan, p. 227
৬. White House Tapes, Oval Office 613-12, 4 November 1971, 9:40 am; cited in Bass, p. 262
৭. Conversation between Nixon and Kissinger, 6 December 1971, Foreign Relations United States (FRUS) E-7, doc, 162; cited in Raghavan, p. 224
৮. সিরাজুল হক
৯. আহমদ (২০১৪), পৃ. ৫৪
১০. লেনিন, নূহ-উল-আলম (২০১৫)। *কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস প্রসঙ্গ ও দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬৮৪-৬৮৫
১১. Khan, Arshad Sami, p. 194
১২. খান (১৯৯৬), পৃ. ৪০-৪১
১৩. Rajgopal, p. 321-323
১৪. পঙ্কজ ভট্টাচার্য
১৫. ওই
১৬. NMML, Haksar Papers, Subject File 225, Sen to Gandhi, 9 June 1971; Jacob to Gill, 15 November 1975, cited in Bass, p. 262
১৭. Khan, Arshad Sami, p. 173-175
১৮. Gandhi, p. 133

১৯. Memorandum of Conversation, 10 December 1971, FRUS 1971, 755-56; cited in Raghavan, p. 248
২০. Khan (1997), p. 371-372
২১. Ibid, p. 372-373
২২. Ibid, p. 373
২৩. Ibid
২৪. Ibid, p. 374
২৫. Ibid, p. 375-377
২৬. Khan, Arshad Sami, p. 183
২৭. Khan (1997), p. 382-385
২৮. Ibid
২৯. Matinuddin, p. 434-435
৩০. Jacob, p. 147
৩১. উবান, মেজর জেনারেল (অব.) এস এস (২০০৫)। *ফ্যান্টমস অব চিটাগাং : দ্য 'ফিফথ আর্মি' ইন বাংলাদেশ*। ঘাস ফুল নদী, ঢাকা, পৃ. ১২০
৩২. তথ্য মন্ত্রণালয় (১৯৮৫), আবদুল খালেকের সাক্ষাৎকার, পৃ. ৫৩
৩৩. Raghavan, p. 264
৩৪. Matinuddin, p. 414-415
৩৫. Banarjee, Sashanka S (2011). *India, Mujibur Rahman, Bangladesh Liberstion & Pakistan*. Aparajita Sahitya Bhaban, Narayanganj, p. 101
৩৬. Jacob, p. 201
৩৭. Wahab, Major General ATM Abdul (2005), *Mukti Bahini wins victory: Military Oligarchy Divides Pakistan in 1971*. Columbia Prokashani, Dhaka, p. 280
৩৮. www.police.gov.bd
৩৯. www.bgb.gov.bd
৪০. Jacob, p. 94
৪১. Haksar, P. N. (1979). *Premonitions*. Interpress, Bombay. p. 88
৪২. Ali, Tariq (1983). *Can Pakistan Survive?* Penguin Book, Middlesex, p. 96
৪৩. *The Report of the Hamoodur Rehman Commission of the Inquiry into the 1971 War* (As Declassified by the Government of Pakistan). Vanguard, Lahore (undated), p. 509-510
৪৪. Ibid, p. 317
৪৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (২০১০)। *সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৫

৪৬. Baxter, Graig (2008), ed. *Diaries of Field Marshall Mohammad Ayub Khan 1962-1978*. Oxford University Press, Karachi, p. 499
৪৭. Gandhi, p. 158-159
৪৮. Record of Conversation with Mujibur Rahman Prepared by D. P. Dhar, 29 January 1972, Subject File 233, P. N, Haksar Papers, NMML; cited in Raghavan, p. 271
৪৯. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পৃ. ৬৩৪
৫০. Karim, p. 251-254; cited from Wolpert, David (1993). *Zulfi Bhutto of Pakistan*. Oxford University Press, New York, p. 173-176
৫১. Khan (1997), p. 406
৫২. Karim, p. 251-254
৫৩. Ibid
৫৪. Ibid
৫৫. Aziz, K K (1993). *The Murder of History: critique of history text books used in Pakistan*. Vanguard, Lahore, p. 154
৫৬. Rezaul Karim, 'Bangabandhu's Historic Landing in Freedom—26 Hours in London', *The Daily Star*, 16 January 1997; Karim, p. 260
৫৭. Karim, p. 262

# যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

**অলি আহমদ :** অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক সর্বাধিনায়ক জিয়াউর রহমানের একান্ত সচিব এবং বিএনপি সরকারের সাবেক মন্ত্রী। বর্তমানে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান। ২৪ আগস্ট ২০১৫

**আ স ম আবদুর রব :** পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে এর একটি অংশের সভাপতি। ২৮ অক্টোবর ২০১৫

**আবু হেনা :** চিকিৎসক। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৫ এপ্রিল ২০১৬

**আমানউল্লাহ :** এপিপির চিফ রিপোর্টার, পিপিআইয়ের ব্যুরো চিফ, বিপিআইয়ের চিফ এডিটর এবং ইউপিআই, *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ও ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা ছিলেন। পরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, *দ্য নিউ নেশন*-এর চিফ এডিটর এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ছিলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

**আরিফ মঈনুদ্দীন :** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক সহকারী অধ্যাপক, বিএনপি সরকারের সাবেক উপমন্ত্রী। ১৩ অক্টোবর ২০১৫

**এস এম ইউসুফ :** ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং পরে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, অবলুপ্ত বাকশালের সাংগঠনিক সম্পাদক। ২১ অক্টোবর ২০১৫

**চৌধুরী খালেকুজ্জামান :** অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সাবেক রাষ্ট্রদূত। ৬ জানুয়ারি ২০১৬

**পঙ্কজ ভট্টাচার্য :** ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্‌ফর) সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে ঐক্য ন্যাপ-এর সভাপতি এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। ১৩ মার্চ ২০১৭

**মমতাজ বেগম :** আওয়ামী লীগের টিকিটে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (১৯৭০) এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য

(১৯৭৩)। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারপারসন। ২২ নভেম্বর ২০১৬

**মোস্তফা মোহসীন মন্টু:** ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক, বর্তমানে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক। ৭ জুলাই ২০১৩

**শাজাহান সিরাজ:** ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাসদের একটি অংশের সাবেক সভাপতি। পরে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পরিবেশ ও বনমন্ত্রী। ২১ মে ২০১১

**সমশের মুবিন চৌধুরী:** অবসরপ্রাপ্ত মেজর, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ও সাবেক রাষ্ট্রদূত। বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান। ১৮ জানুয়ারি ২০১৬

**সিরাজুল আলম খান:** ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বিএলএফের (মুজিববাহিনী) সংগঠক। জাসদের প্রতিষ্ঠাতা। নভেম্বর ২০১৩-মে ২০১৪, ১৭ আগস্ট ২০১৬

**সিরাজুল হক:** চিকিৎসক। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি (১৯৭০-৭২), রাজশাহী শহর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, বিএলএফের (মুজিববাহিনী) ধলেশ্বরী হেডকোয়ার্টারের কোম্পানি কমান্ডার। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। ১৪ এপ্রিল ২০১৬

# নির্ঘণ্ট

এ



ও



ক



খ



গ



চ



ছ



জ